ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

বিজুরি

দ্বিতীয় সংখ্যা

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

বিজুরি

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা	:	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইফুল হক আহমেদ এনডিসি, পিএসসি অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এনামুল ইসলাম, পিএসসি, পিএইচডি (প্রাক্তন অধ্যক্ষ)
তত্ত্বাবধানে	:	দেওয়ান মোঃ তমজিদুজ্জামান, উপাধ্যক্ষ (পরীক্ষা ও সমন্বয়)
সম্পাদক	:	সুলতানা নাছিরা, সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা)
সম্পাদনা সহযোগী (বাংলা)	:	মাহমুদা হাশেম, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা মোঃ আবু সায়েম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভজন কুমার সাহা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা মীর মোঃ হারুন উর রশীদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ফারজানা আখতার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ফাহিদা সুলতানা, প্রভাষক, বাংলা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মালেক, প্রভাষক, বাংলা
সম্পাদনা সহযোগী (ইংরেজি)	:	এম. জিয়াউর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি মোঃ রমজান আলী, প্রভাষক, ইংরেজি মোঃ ইমরান হোসেন, প্রভাষক, ইংরেজি রোকাইয়া মণি, প্রভাষক, ইংরেজি দীপান্বিতা অমিতা দাস, প্রভাষক, ইংরেজি
আলোক চিত্র	:	মোঃ তারিকুল ইসলাম সরকার, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি
প্রশাসনিক সহযোগিতা	:	দেওয়ান মোঃ নাজমুল করিম, ভারপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্গ সজ্জা	:	আজাদ হোসেন, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, প্রিন্টফিউশন কোম্পানি আপেল মাহমুদ রুবেল, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, প্রিন্টফিউশন কোম্পানি

প্রকাশকাল	:	পৌষ-১৪৩২ ডিসেম্বর-২০২৫
ডিজাইন ও মুদ্রণ	:	প্রিন্টফিউশন কোম্পানি, কলেজ গেইট, টঙ্গী, গাজীপুর-১৭১১।

অধ্যক্ষ
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

বাণী

ঐতিহ্যগতভাবে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি সৃজন-প্রতিভার বিকাশ ও সুকুমার বৃত্তির চর্চায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। আজকের শিক্ষার্থীরা নিজেদের জগৎ জাগানিয়া আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব দেবে আগামীর দেশমাতৃকা ও বিশ্বকে। মানুষের মননশীলতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি, আবেগীয় বিকাশ সাধন এবং জাতীয় চেতনা ও আত্মপরিচয় গঠনে সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি, প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহার ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আগ্রাসী আসক্তি আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বিচ্যুত করেছে জীবন জগতের মৌলিক বাস্তবতা থেকে। আমাদের তরুণ প্রজন্মের এই আগ্রাসী আসক্তি থেকে মুক্তির অন্যতম ক্ষেত্র হলো শিল্প-সাহিত্যচর্চা যা তরুণদের মূল্যবোধ ও ইতিবাচক জীবনবোধের শিক্ষা দেয়। সাহিত্যের নির্মল স্পর্শে শিক্ষার্থীরা জীর্ণতা ও কুসংস্কারের তমসাকে দূরীভূত করে মনুষ্যত্বলোকে উন্নীত হয়ে জীবনকে উপভোগ করতে পারে। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শিল্প-সাহিত্যচর্চার সুযোগ প্রশস্ত করতে কলেজ বার্ষিকী 'অনুপ্রাণন' এর পাশাপাশি ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'বিজুরি'-র প্রকাশ চলমান রয়েছে।

আজকের শিক্ষার্থীর শিল্প-সাহিত্য অভিরুচির স্বাক্ষর স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করবে। আমাদের সৃজিত 'বিজুরি' শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা, মনন-চিন্তন ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের এক অম্লান স্মৃতিস্মারক। আজকের শিক্ষার্থীরা একদিন প্রকৃত মানুষ হয়ে জীবনের সোনালি অধ্যায়ে উপনীত হবে। সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনে এই 'বিজুরি'-র পাতা উল্টে শিক্ষার্থী ভাববে, তার শৈশব-কৈশোর কত সমৃদ্ধ ছিল!

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সৃজনব্যঞ্জনায় ব্যাকুল একঝাঁক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের লেখায় 'বিজুরি' কলেবর নির্মিত হল। যাদের লেখায় 'বিজুরি' সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের অভিনন্দন জানাই। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে যাদের লেখা প্রকাশ করা গেল না, আশা করি ভবিষ্যতে তাদের লেখা প্রকাশিত হবে। অধিক শিক্ষার্থীর লেখা প্রকাশের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে 'বিজুরি'-র কলেবর বৃদ্ধি করা হবে।

ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'বিজুরি' ২য় সংখ্যা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইফুল হক আহমেদ, এনডিসি, পিএসসি

সম্পাদকীয়

ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'বিজুরি' শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উন্মোচিত করার এক অনন্য স্মারক। 'বিজুরি'-তে লেখা শিক্ষার্থীদের গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও আত্মজৈবনিক রচনাগুলো যেন তাদের হৃদয়ের ভাষা, অনুভবের স্বাক্ষর, ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে নিজেদেরকে আবিষ্কার করছে- শব্দে, বাক্যে ভাবনায় ও চিত্রপটে।

আমরা বিশ্বাস করি, 'বিজুরি' শিক্ষার্থীদের 'সাহিত্য সাধনা', শিল্পসত্তা এবং সৃজনশীলতার প্রতি আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করবে এবং আগামী দিনে তাদের আত্মপ্রকাশের একটি উজ্জ্বল দিগন্ত উন্মোচন করবে।

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইফুল হক আহমেদ এনডিসি, পিএসসি মহোদয় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে 'বিজুরি'-র চলার পথ মসৃণ করে দিয়েছেন। স্যারের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সম্পাদনা পর্ষদকে অসংখ্য ধন্যবাদ নিরলস পরিশ্রমের জন্য।

'বিজুরি'-র অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক।

সুলতানা নাছিরা
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে বাংলাদেশ

ইশরাত জারীন
সহযোগী অধ্যাপক ও
বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল ও পরিবেশ

ভূমিকম্প পৃথিবীর একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যা মুহূর্তেই অসংখ্য প্রাণহানি ঘটাতে পারে। পৃথিবীতে ৭টি বড় প্লেট এবং অসংখ্য ছোট ছোট সাবপ্লেট রয়েছে। পৃথিবীর এই প্লেটগুলো মূলত Asthenosphere এর উপর অবস্থিত। Asthenosphere এর অবস্থান পৃথিবীর অভ্যন্তরে। এখানে যে খনিজ উপাদান দেখা যায় তা হচ্ছে সিলিকেট, লোহার যৌগ এবং ম্যাগনেসিয়াম। আবার এই ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেটের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে উচ্চ তাপমাত্রার সহনশীল খনিজ। এই সাথে রয়েছে এই অংশে অত্যধিক তাপ ও চাপ। যার ফলে এই পদার্থগুলো আংশিক গলিত অবস্থায় থাকে। এই গলিত অংশই প্লেটগুলোকে ভাসতে সাহায্য করে। যার ফলে প্লেটগুলো কখনো কখনো একটি অপরটি থেকে দূরে সরে যায় আবার কখনো বা পরস্পরের কাছে চলে আসে। আবার কখনো একটি প্লেট অপর প্লেটের উপর উঠে যায়।

বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক অবস্থান

যখন দুইটি টেকটনিক প্লেট একে অপরের সাথে ধাক্কা খায় তখন তারা এভাবে সরে না গিয়ে একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে ভূঅভ্যন্তরে চাপ ও শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। এই চাপ বা শক্তি ভূপৃষ্ঠে সহজে বোঝা যায় না বা দেখা যায় না। প্লেট যখন চলাচল শুরু করে তখন ভূঅভ্যন্তরে ইলাস্টিক শক্তির সৃষ্টি হয়। সেই জমা শক্তি এক সময় ফাটল সৃষ্টি করে বেরিয়ে আসে, আর তখনই ভূপৃষ্ঠে কম্পন শুরু হয় আর এ কম্পনই হচ্ছে ভূমিকম্প। বাংলাদেশে টেকটনিক প্লেটের চাপ জমে উঠেছে বিগত ৪০০ বছর ধরে।

বাংলাদেশে কয়েক বছরে ঘটে যাওয়া ছোট ছোট ভূমিকম্পই হচ্ছে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হবার একটি পূর্বাভাস। বাংলাদেশ ৩টি সক্রিয়

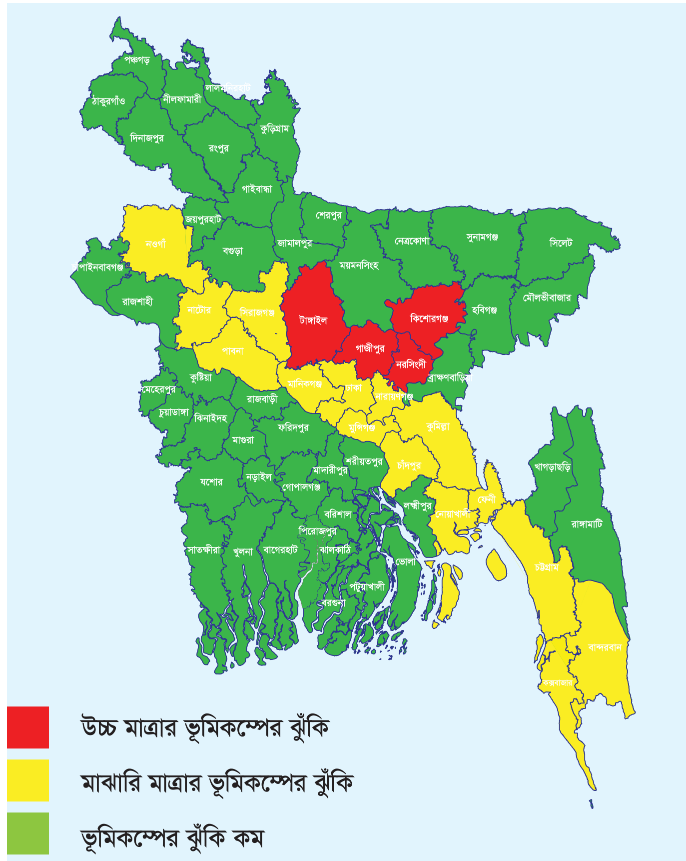

টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থলের খুব কাছাকাছিতে অবস্থিত। প্লেট তিনটি হচ্ছে:

১. ভারতীয় প্লেট
২. ইউরেশীও প্লেট
৩. বার্মা প্লেট

বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড ও সীমান্তবর্তী এলাকায় বেশ কয়েকটি Fault বা ফাটল রয়েছে। এই হিসেবে পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ মিয়ানমারের উপকূল বরাবর বঙ্গোপসাগরে নিচে এক বিশাল সাবট্রাকশন zone রয়েছে। ২০১৬ সালে প্রকাশিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হয় যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় একটি গোপন (hidden fault) ফাটল রয়েছে। যা বাংলাদেশে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। এই ফাটলটি মাইলের পর মাইল পললের নীচে অবস্থিত, যেটি সাবট্রাকশান জোনের মধ্যে পড়েছে।

সাবট্রাকশান জোন হচ্ছে সমুদ্র তলদেশে এমন একটি এলাকা যেখানে দুটি টেকটনিক প্লেট মুখোমুখি অবস্থানে থাকে এবং প্লেট দুটি পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এমন অবস্থায় একটি প্লেট অপর আরেকটি প্লেটের নীচে চলে গেলে সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প।

গবেষকরা এটাকে এভাবে নিশ্চিত করেছেন যে কিশোরগঞ্জে যে হাওর রয়েছে সেটি দিয়ে মেঘনা নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরের আন্দামানের পাশ দিয়ে যদি দক্ষিণে একটা রেখা কল্পনা করা যায়, সেই রেখাটি হচ্ছে দুটি টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থল। যার পূর্বটি হচ্ছে বার্মা প্লেট আর পশ্চিম হচ্ছে ইন্ডিয়া প্লেট।

এই সংযোগস্থলের উত্তর দিকটা সুনামগঞ্জ থেকে শুরু করে মনিপুর এবং মিজোরাম পর্যন্ত অঞ্চলটিতে প্রচুর শক্তি জমা করেছে। গবেষকরা বলছেন জমাকৃত এই শক্তি ঘটাবে ভয়াবহ ভূমিকম্প। এই শক্তির দ্বারাই আজ হোক কাল হোক বা আগামী ২৫ বছরেই হোক, এর দ্বারা ঘটবে ভয়াবহ ভূমিকম্প যার কোন বিকল্প নাই।

টেকনাফ থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত ৪০০ কিলোমিটার জায়গায় যে Fault line রয়েছে সেখানেও ১৭৬২ সালে ৮.৫ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হয় আর সে কারণে সেন্টমার্টিন দ্বীপ ৩ মিটার উপরে উঠে আসে। এর পূর্বে সেন্টমার্টিন দ্বীপ ছিল ঘুমন্ত দ্বীপ।

বিশেষজ্ঞদের মতে ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা। ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী জেলার অংশবিশেষ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ, কুমিল্লার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। মাঝারি মাত্রার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, নাটোর।

এ ভয়াবহ ভূমিকম্প যদি ঘটে তাহলে প্রাণহানি হবে প্রায় তিন লাখের মতো। শুধু তাই নয়, ঢাকার গ্যাস লাইন বিদ্যুৎ সংযোগ এগুলো বিপত্তি ঘটিয়ে সৃষ্টি করতে পারে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড।

সুতরাং এখন থেকেই আমাদের সচেতন হয়ে প্রতিটি বাড়িঘর নির্মাণ এর সময় বিল্ডিং কোড মেনে চলতে হবে এবং বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তৈরি করার মানসিকতা এখন থেকেই গ্রহণ করতে হবে। তবেই এর ভয়াবহতার হাত থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

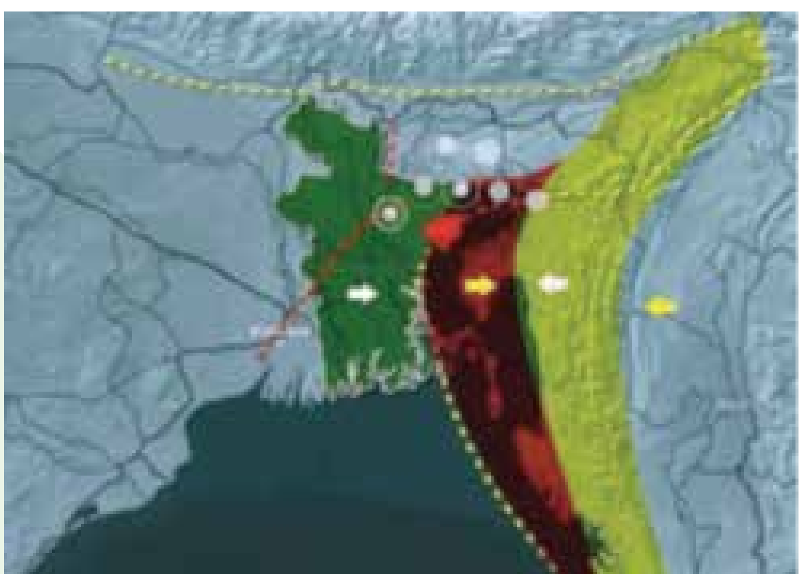

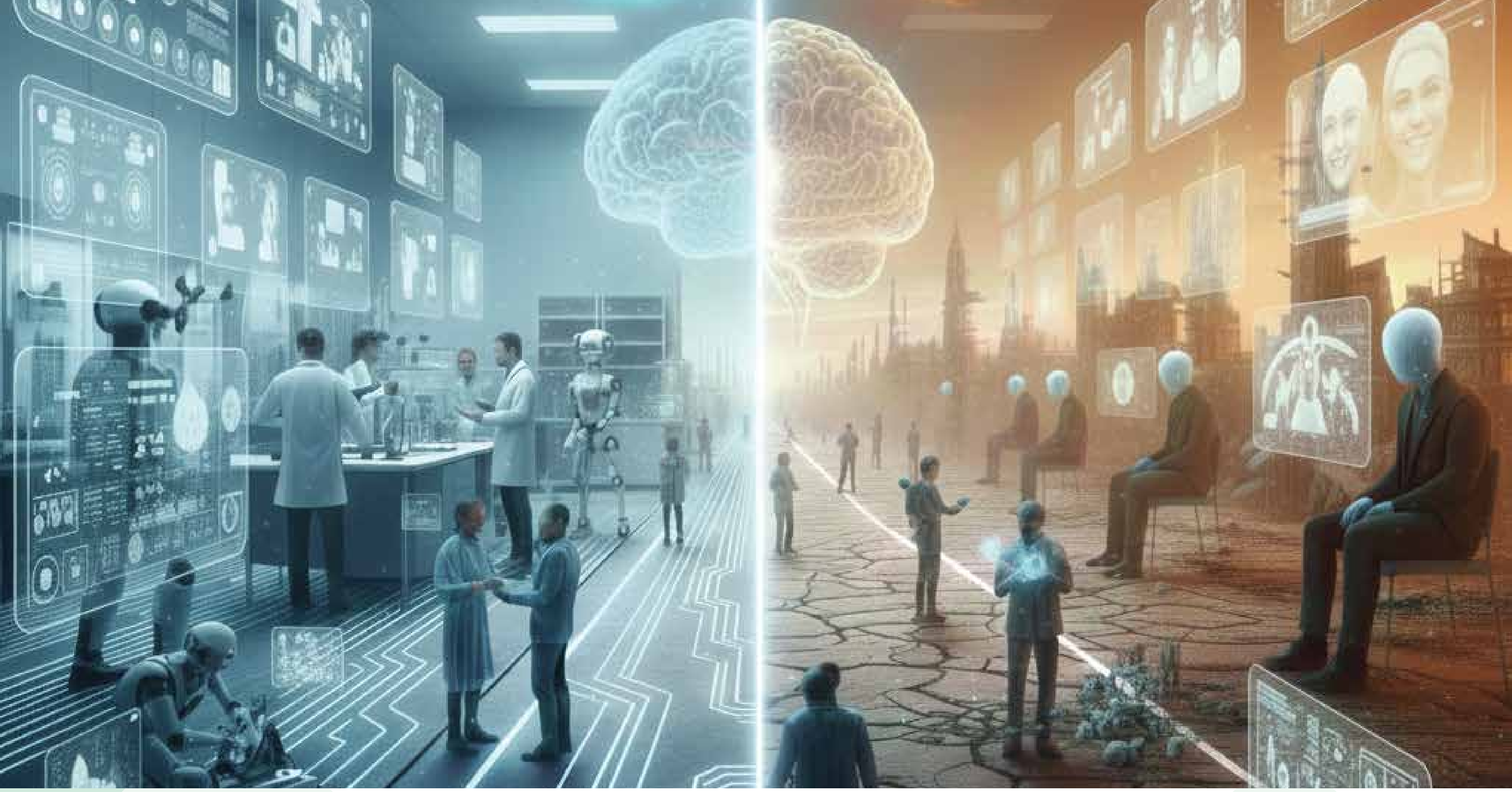

এআই যুগে প্রযুক্তিগত সুবিধার ব্যবচ্ছেদ– বাস্তবতা বনাম মরীচিকা: প্রযুক্তি কি সত্যিই আমাদের জীবনকে সহজ করছে?

সেলিম আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক (কৃষিশিক্ষা)
ইংরেজি মাধ্যম-প্রভাতি শাখা

বিশ শতকের শেষে প্রযুক্তি আমাদের সামনে এক ইউটোপিয়ান বা স্বর্গীয় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়েছিল। বলা হয়েছিল, এটি পৃথিবীকে একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এ পরিণত করবে, তথ্যের মহাসড়ক আমাদের জ্ঞানকে উন্মুক্ত করবে এবং মানুষের জীবনযাত্রাকে আগের চেয়ে বহুগুণে সহজ করে তুলবে। কিন্তু আজ, এই প্রতিশ্রুতির মাত্র সিকি শতাব্দী পর, আমাদের কঠোরভাবে প্রশ্ন করতে হচ্ছে: এই তথাকথিত সুবিধা কি আদতে এক মরীচিকা? প্রযুক্তি কি আমাদের জীবনকে সহজ করার বদলে এক অদৃশ্য খাঁচায় বন্দি করে আরও জটিল করে তুলছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা প্রযুক্তিগত সুবিধার কয়েকটি প্যারাডক্স বা আপাতবিরোধী সত্যের মুখোমুখি হই বৈকি!

১. সংযোগ বা কানেক্টিভিটি প্যারাডক্স: কানেক্টিভিটির এই স্বর্ণ-যুগে চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা।

একসময় আমাদের হাতে স্মার্টফোন ছিল না। তখন অবসর মানে ছিল হাতের কাছে পাওয়া যেকোনো বই, পুরোনো পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে ডুবে যাওয়া। কিংবা পাশে বসে থাকা মানুষটির সাথে গল্প, আড্ডা বা বিতর্কে মেতে ওঠা। MIT-এর সমাজবিজ্ঞানী Sherrz Turkle তার এক অদ্ভুত শিরোনামের "Alone Together" বইতে এই বিষয়টিকে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আমরা এখন এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে আমরা ক্রমাগত সংযুক্ত (Connected) থাকছি; কিন্তু মানসিকভাবে আমরা একে অপরের থেকে আগের চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন। তাঁর মতে- "আজকের কফি শপের দৃশ্যটি কল্পনা করুন: একটি টেবিলে চারজন বন্ধু বসে আছে, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ ফোনের স্ক্রিনে নিমগ্ন। হায় তারা একসাথে থেকেও মূলত একা। অনিবার্যভাবেই, এই ডিজিটাল বুদবুদ আমাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং একাকীত্বকে এক নতুন মহামারিতে রূপ দিয়েছে।

২. অবাধ তথ্য প্রবাহের প্যারাডক্স: আমাদের কাছে আজ অসীম তথ্যভাণ্ডার, কিন্তু চিন্তার গভীরতা শূন্যের কোঠায়।

ইন্টারনেটের কল্যাণে আজ পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান আমাদের হাতের মুঠোয়। ইউটিউব, কোর্সেরা, ইডিএক্স, ইউডেমি বা স্কিল-শেয়ারের মতো প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার রিসোর্স রয়েছে যা ব্যবহার করে যেকোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা কী? তরুণ

প্রজন্মের একটি বিশাল অংশ এই জ্ঞানভাণ্ডারে ডুব না দিয়ে মূলত হারিয়ে যাচ্ছে অনলাইন গেমিং বা সোশ্যাল মিডিয়া-প্রসূত অন্তহীন নিউজফিড আর রিলস স্ক্রোলিংয়ের জগতে। লেখক Nicholas Carr তার পুলিৎজার-মনোনীত বই "The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains"-এ এই সংকটকে তুলে ধরেছেন। তিনি যুক্তি দেন, ইন্টারনেট আমাদের মস্তিষ্ককে 'ডিপ থিংকিং' বা গভীর চিন্তা থেকে সরিয়ে 'হাইপার-রিডিং' বা অগভীর ও বিক্ষিপ্ত পাঠের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আগেকার দিনে একটি তথ্য খুঁজে বের করার জন্য লাইব্রেরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই ঘাঁটতে হতো, যা আমাদের মধ্যে ধৈর্য, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং কল্পনাশক্তি তৈরি করত। আর এখন? ChatGPT/Gemini তে একটি প্রম্পট দিয়ে কপি-পেস্ট করার সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে। এই 'অদ্ভুতুড়ে সুবিধা' কি আদতে আমাদের মস্তিষ্ককে অলস করে দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে আমাদের জ্ঞানীয় দক্ষতাকে (cognitive skills) ভোঁতা করে দিচ্ছে না?

৩. মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্যারাডক্স: সবার সবকিছুর আপডেট জানি বলে গর্ব করি, কিন্তু নিজের শান্তি উধাও।

প্রযুক্তির আগের যুগে প্রিয়জনের খবর পেতে মাসের পর মাস চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে হতো। সেই অপেক্ষার মধ্যে এক ধরনের মাধুর্য ছিল। আর এখন? আমরা কেবল কাছের মানুষের নয়, বরং দূরের, প্রায়-অচেনা মানুষের প্রতি মুহূর্তের আপডেট পাচ্ছি। তাদের সাফল্য, ভ্রমণ আর 'স্ক্রিন-পারফেক্ট' জীবনের প্রদর্শনী দেখে নিজের অজান্তেই আমাদের ভেতর জন্ম নিচ্ছে ঈর্ষা, হীনম্মন্যতা এবং অন্তহীন স্ট্রেস।
এই বিষয়টিকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা "Compare and Despair" (তুলনা এবং হতাশা) সিনড্রোম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন আমরা অন্যের জীবনের বহুল সম্পাদিত এবং ফিল্টার করা সেরা মুহূর্তগুলোর সাথে আমাদের নিজেদের অপরিশোধিত ও রঙ-চটা বাস্তবতাকে তুলনা করি, তখন হতাশা জন্ম নিতে বাধ্য। প্রযুক্তি আমাদেরকে নিয়ত তথ্যের ভারে জর্জরিত করছে, কিন্তু অবধারিতভাবে মানসিক শান্তি কেড়ে নিচ্ছে।

৪. কর্মসংস্থানের প্যারাডক্স: বিশেষায়িত দক্ষতার চাহিদা বাড়ছে, কিন্তু চাকরির স্থায়িত্ব কমছে।

এক যুগ আগেও একটি মাত্র ডিগ্রি দিয়ে একটি সফল ক্যারিয়ার জার্নি পার করে দেওয়া যেত। কিন্তু আজকের প্রযুক্তিচালিত বিশ্বে ডিগ্রির চেয়ে দক্ষতার মূল্য বেশি। কিন্তু সেই দক্ষতারও যেন কোনো স্থায়িত্ব নেই। আজ যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডিজিটাল মার্কেটিং কৌশল প্রাসঙ্গিক, কালই তা পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তি এক দিকে যেমন নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করছে, তেমনই পেশাজীবীদের এক অন্তহীন 'কন্টিনিউয়াস লার্নিং' এবং 'এডাপ্টেশন'-এর চক্রের মধ্যে ফেলে দিয়েছে; আর তৈরি করছে একরাশ হতাশা ও স্ট্রেস। একই সাথে, অর্থনীতিবিদ Joseph Schumpeter-এর "Creative Destruction" তত্ত্বটি আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। উবারের কারণে যেমন ট্যাক্সি ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস হয়েছে, তেমনি সেলফ-ড্রাইভিং কার (Wazmo bz Google; Robotaxi bz Tesla) হয়তো দ্রুতই ড্রাইভারের চাকরিকে অপ্রয়োজনীয় করে দেবে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ Yuval Noah Harari Zvi "21 Lessons for the 21st Centurz" বইতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, AI (Artificial Intelligence) এবং অটোমেশন হয়তো ভবিষ্যতে একটি নতুন 'অপ্রয়োজনীয় শ্রেণি' (useless class) তৈরি করবে, যাদের অর্থনৈতিক মূল্য সমাজে প্রায় শূন্য হয়ে পড়বে। একদিকে AI তার মালিকদের পেট ভরাচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের চাকরি কেড়ে নেওয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

৫. নিয়ন্ত্রণহীনতা বনাম নিয়ন্ত্রণের প্যারাডক্স: সোশ্যাল মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণহীন প্ল্যাটফর্মে ভিউ নামক মনোযোগ আকর্ষণের বাজার।

আগে পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা টেলিভিশনে কী দেখানো হবে, তার একটি সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ বা মডারেশন ছিল। কিন্তু ফেসবুক, ইউটিউব বা টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর মূল চালিকাশক্তি হলো তাদের ব্যবসা-প্রসারমুখী ভিউয়ার এর নিমগ্নতা নিশ্চিত করে এমন অ্যালগরিদম, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যবহারকারীর মনোযোগ ধরে রাখা। হার্ভাডের অধ্যাপক Shoshana Zuboff এই মডেলকে "Surveillance Capitalism" হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, যেখানে ব্যবহারকারীর মনোযোগই হলো পণ্য। এই মডারেশনহীন প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রায়শই সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং shallow বা অগভীর কন্টেন্টগুলোই বেশি ভাইরাল হয়। কারণ, এগুলো মানুষের আদিম অনুভূতিকে নাড়া দেয়। বলাই বাহুল্য, এর ফলে পরবর্তী প্রজন্ম এমন ব্যক্তিদের 'রোল মডেল' হিসেবে গ্রহণ করছে, যারা সমাজের জন্য ইতিবাচক কোনো বার্তা বহন করে না।

উপসংহার: প্রযুক্তি থেকে পালানো নয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করাই পথ।

এই আলোচনা এই নয় যে, প্রযুক্তির inherently খারাপ। আগুন যেমন রান্না করতে পারে, তেমনি ঘর জ্বালিয়েও দিতে পারে। সমস্যা প্রযুক্তির নয়, সমস্যা এর লাগামহীন এবং অচেতন অপব্যবহারের। আমরা এমন এক স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি, যেখান থেকে পেছনে ফেরার উপায় নেই। গুহায় ফিরে যাওয়া কোনো সমাধান নয়। প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে সচেতনতা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। লেখক Cal Newport তার "Digital Minimalism" বইতে যে দর্শন প্রচার করেছেন, তা আজ অত্যন্ত জরুরি। আমাদের প্রযুক্তিকে একজন প্রভুর মতো গ্রহণ না করে, একজন ভৃত্যের মতো ব্যবহার করতে শিখতে হবে। ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়ার কাছে মানসিকভাবে দুর্বল না হয়ে, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, রুটিন এবং ডিসিপ্লিন তৈরি করে তা থেকে প্রয়োজনমাফিক সুবিধা আদায় করে নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত, প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জটি প্রযুক্তিগত নয়, বরং এটি একটি মানবীয় চ্যালেঞ্জ। এটি আমাদের মনোযোগ, শৃঙ্খলা এবং প্রজ্ঞার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন।

প্রকৃতির বিস্ময়

আহনাফ বিন মনির
কলেজ নং- ৮০২৭
দশম, বিজ্ঞান-ক
বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা

এই বিশ্বে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের সত্যিই তুলনা নেই। এই পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে আছে কত শত নদী-পাহাড়-মরুভূমি। আর তার সাথে নাম না জানা গাছপালার সমাহার। রহস্যময় এই প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানেরই একটি নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে। কখনও তা ভয়ংকর রূপে আমাদের সামনে ধরা দেয় আবার কখনও তা আমাদের চোখ-মন জুড়িয়ে দেয়। প্রকৃতির বুকে লুকিয়ে থাকা এই অপার রহস্য মানুষ আজও পুরোপুরি উন্মোচন করতে পারে নি। প্রকৃতির সেসব অজানা কিছু রহস্য আর সৌন্দর্য তোমাদের সামনে তুলে ধরবো।

প্রজাপতির স্বর্গরাজ্য:

তোমরা কি কখনও প্রজাপতির স্বর্গরাজ্যের কথা শুনেছ? এটা কিন্তু কোন দ্বীপ বা অঞ্চল নয়। বরং মেক্সিকোর কেন্দ্রীয় পাহাড়ি অঞ্চলের বনভূমি (Michoacan I Estado de Mexico রাজ্যে অবস্থিত)। যেটিকে বলা হয় 'Monarch Butterfly Reserve'। ইউনেস্কো একে World Heritage site ঘোষণা করেছে। তবে অনেক ভ্রমণপ্রেমী একে Butterfly Island বা প্রজাপতির স্বর্গরাজ্য বলে থাকেন।

প্রতি বছর অক্টোবর থেকে মার্চ বিশেষত শীতকালে উত্তর আমেরিকার কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোটি কোটি মনার্ক প্রজাপতি প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে অবিশ্বাস্য পতঙ্গ-মাইগ্রেশন ঘটনাগুলোর একটি। এই বনগুলোতে প্রচুর Oyamel Fir গাছ আছে, যা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় প্রজাপতিদের আশ্রয় দেয়। পুরো বনজুড়ে গাছের ডালে, পাতায় যখন অসংখ্য কমলা-কালো ডানার মনার্ক প্রজাপতি উড়তে থাকে। সূর্যের আলো পড়লে তখন মনে হয় আকাশ কমলা রঙের ফুলে ভরে গিয়েছে। আরো একটি আশ্চর্যের বিষয় হলো এদের আয়ু মাত্র কয়েক মাস এবং এক প্রজন্ম মারা যাওয়ার পর তাদের বংশধররা ঠিক একই পথে ফিরে আসে।

বনরূপী গাছ ঃ

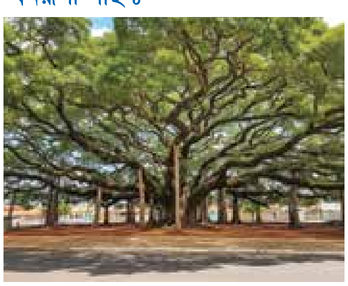

ছবিতে তোমরা কী দেখছ? দেখে মনে হচ্ছে একটি বনভূমি। তবে এটি কোনো বন নয়- এটি একটি মাত্র গাছ। অবাক লাগছে?

প্রকৃতি মাঝে মাঝে এমন সব বিস্ময় উপহার দেয় যা মানব কল্পনাকেও হার মানায়। আমরা সাধারণত একটি গাছকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা সীমিত আকারের ভাবতেই অভ্যস্ত। কিন্তু ব্রাজিলের নাটাল (Natal) শহরে আছে এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়- বিশ্বের সবচেয়ে বড় কাজুবাদাম গাছ। এই গাছটি এতো বিশাল যে দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন একটি বনভূমি।

এই মহাগাছের বিস্তার ৮৫০০ বর্গমিটার আকারে এটি একটি ফুটবল মাঠের থেকেও অনেক বড়। গাছটির ডালপালা মাটির দিকে নেমে এসে আবার শিকড় গেড়ে বসে যায় এবং সেখান থেকে নতুন ডাল গজায়। এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কারণেই গাছটি ক্রমশ চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে বিশাল এক সবুজ ছাতায় রূপ নিয়েছে। বর্তমানে গাছটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০০ মিটার ছুঁয়েছে। এই বিস্ময়কর কাজুবাদাম গাছটি ব্রাজিলের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রিও গ্রান্দে দো নর্তে (Rio Grande do Norte) রাজ্যের রাজধানী নাটাল শহরের নিকটবর্তী পিরাঙ্গি (Pirangi do Norte) এলাকায় অবস্থিত। স্থানীয়দের ধারণা গাছটির বয়স প্রায় ১৮৮ বছর বা তারও বেশি। নাটালের এই একটি মাত্র কাজুবাদাম গাছ পুরো একটি শহরকে ঢেকে রেখেছে, যা কেবল ব্রাজিল নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই এক অনন্য ঐতিহ্য। একটি মজার বিষয় বলে রাখছি, এই বনরূপী গাছটি দেখতে গেলে কিন্তু রোনালদো কিংবা রিভালদোর সাথেও দেখা হয়ে যেতে পারে। তারা কিন্তু এই শহরেই বাস করে।

সালফার সিটি ঃ

পর্যায় সারণির ১৬ নং মৌলটির কথা কি মনে আছে ? এই মৌলটির দ্বারা তৈরী একটি City রয়েছে। হ্যাঁ এই মৌলটির নাম হলো সালফার আর এই সালফার দ্বারা তৈরি City এর নাম 'সালফার সিটি'।

নিউজিল্যান্ডের একটি জনপ্রিয় শহর রোটোরুয়া। অতি পরিচিত রোটোরুয়া হ্রদের নামেই শহরটির নামকরণ করা হয়েছে। রোটোরুয়া হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত শহরটির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জিয়োথার্মাল শক্তি। এর প্রভাবে সেখানে তৈরি হয়েছে অসংখ্য উষ্ণ প্রস্রবণ বা গিজার। এই অঞ্চলে এতো ভূ-তাপীয় শক্তির উৎপাদন হয় যে এর ফলে বাতাসে সালফার গ্যাসের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। আর এ কারণে শহরের আনাচে কানাচে পঁচা ডিমের গন্ধ সবসময়ই পাওয়া যায়। এজন্য রোটোরুয়া 'সালফার সিটি' হিসেবেও অনেকের কাছে পরিচিত। এই রোটোরুয়া গিজারগুলো সাধারণ গরম পানির গিজার নয়। সেখানে গরম জলের সাথে মিশে থাকে মাটি ফলে তৈরি হয় কাদার গিজার। আগুনে কোনো তরল পদার্থকে অনেকক্ষণ ধরে উত্তপ্ত করলে যেমনভাবে ফুটতে থাকে তেমনি এই হ্রদের কাদামাটি প্রতিনিয়ত ফুটতে থাকে।

বিজ্ঞানীদের মতে এই হ্রদের পানি নির্দিষ্ট এই স্থানে উত্তপ্ত পাথরের উপর দিয়ে বয়ে যায় বলে এ ধরণের অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই কাদার বুদবুদ দেখার জন্য বহু পর্যটক বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখতে আসেন।

রুম নং ৬০৮

সায়মা ইসলাম সুবা
কলেজ নং- ২২৫৭
দ্বাদশ, বিজ্ঞান-ঘ
বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা

৬০৮ এটি আমার কাছে শুধু একটি সংখ্যা না একটি আবেগের নাম। ৬০৮ নামক সংখ্যা দিয়ে শুরু হয় আমার জীবনের নতুন অধ্যায়ের। ৬০৮ সংখ্যাটি শুনলেই মনে হয় আমার হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে রক্ত পাম্প করে ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা দেহে।

এবার আসি মূল কথায়, সময়টা ২০২২, ৩রা জানুয়ারি। যেদিন আমি কলেজ হোস্টেলের এই রুমে উঠেছিলাম। বাবা এবং বোন এসেছিল হোস্টেলে রাখতে। যতই তাদের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছিল ভয়ে এবং কষ্টে আমার বুকটা যেনো সংকুচিত হয়ে কোথাও একটা লুকানোর জায়গা খুঁজছিল। এত বড় শহরে শুধু একা আমি। কোনরকম কান্না চেপে রেখে বিদায় দিলাম বাবা আর বোনকে। আমি সেইদিন বিকেলে হোস্টেলে উঠেছিলাম, তাই রাত আমার কাছে ধরা দিল খুবই তাড়াতাড়ি। প্রচণ্ড ক্লান্ত, তবুও ঘুম নেই চোখে। হোস্টেলে সবার কাছেই তাদের খাটের সাইজ নিতান্তই ছোট বলে মনে হতো। কিন্তু কেন জানি না! আমার কাছে আমার খাটকে একটা বড় মরুভূমি মনে হতো। আশেপাশে কেউ নেই, পানির খোঁজে আমি দিশেহারা। ছোটবেলা থেকেই আমার যে গুণটার কথা পরিবারের মানুষের কাছে শুনে আসছি তা হলো আমি কান্নাকাটি করতে চরম পারদর্শী। এ বিষয়ে আমাকে হারানো এত সহজ নয়। নিজের এই পারদর্শিতাই প্রকাশ করতে লাগলাম হোস্টেলে।

সকালে একবার ঘুম থেকে উঠে, বিকেলে এবং সন্ধ্যায় মিলে তিনবার, রাতে একবার ঘুমাতে যাওয়ার আগে একদম প্রেসক্রিপশনে লিখে দেওয়া ঔষধের মত কান্নার রুটিন চালাতে লাগলাম। এর কিছুদিন পরে ভর্তি শুরু হলো একাদশ শ্রেণিতে। রুমমেট হলো আরো তিনজন সিনিয়র আপু। একে তো কষ্টের শেষ নেই তারপর আবার সিনিয়র! মনে মনে খুবই রাগ হতে লাগলো। ভাবলাম তারা রুমে আসলে একদম কথা বলব না। কিছু করতে বললে তো করবই না। তারা যখন ৬০৮ নামক রুম তথা আমার রুমে প্রবেশ করল তাদের হাসিমাখা মুখ এবং কথা বলা দেখে আমার করা প্রতিজ্ঞা ধরে রাখতে পারলাম না। আমিও হেসে কথা বলা শুরু করলাম। একজন প্রিয়ন্তি, অপরজন অর্পা এবং সবচেয়ে রুগ্ন এবং পড়ুয়া আপু নুসরাত। তাকে দেখে মনে মনে ভাবলাম আমাকে তার মতই হতে হবে। নুসরাত আপু ছিল আমার অনুপ্রেরণার উৎস। কোনকিছু নিয়ে হতাশ হলেই ছুটে যেতাম প্রিয়ন্তি আপুর কাছে তার যত কাজই থাকুক না কেন সব ফেলে যত রকম ভাবে বোঝানো যায় বোঝাতো আমাকে। সন্ধ্যা হলেই অর্পা আপুর মজার সব কর্মকাণ্ড এবং কথা আমাকে সবসময় বিনোদন দিত। এর মাঝে যে একেবারে নিজের গুণটার কথা ভুলে গেছি তা কিন্তু নয়। যখন আমি কান্না করতাম কতই না বিরক্ত হত তারা, কিন্তু একটি বারের জন্যও তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি।

এখন যখন আমি সিনিয়র তখন আরো বেশি করে মনে পড়ে তাদের কথা। কীভাবে তারা আমাকে সহ্য করেছিল? এখনো তাদের কথা আমার অনেক মনে পড়ে। তারা ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে অন্যরকম এক ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের নাম। কখনই মনে হয়নি তারা আমার সিনিয়র।

আমার কাটানো সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো আবদ্ধ আছে ৬০৮নং রুমে।

"তোমরা আমার জীবনের অন্যরকম এক অনুভূতি
আমার বুকের ভিতরে অনেকটা জায়গা জুড়ে যার বিস্তৃতি।"

মুক্তিযোদ্ধা আমির আলীর দিনলিপি

এম টি রশিদ মৌন
কলেজ নং-১৬৫০
একাদশ, বিজ্ঞান-খ
বাংলা মাধ্যম-প্রভাতি শাখা

৬ আগস্ট, ২০২৪, মঙ্গলবার।

সকালের পত্রিকা দেখার পর থেকে অসম্ভব বিক্ষিপ্ত হয়ে আছি। প্রথম পৃষ্ঠাতেই এক মহিলার ছবি ছেপেছে, শান্ত ভঙ্গিতে বসে থাকা এক মহিলা, শুধু চোখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। তার চোখের যে চাহনি, সেই চাহনি কেবল মৃতদের চোখেই হতে পারে, হিমশীতল, অসম্ভব রকম শূন্য। এমন দৃষ্টি আর একবারই দেখেছিলাম আমি, সেই ৭১ এ।

হেডলাইন পরে জানলাম, মহিলার ছেলে জুলাই অভ্যুত্থানের শহিদ, তার পরের অংশ পড়তে পারিনি আমি। মহিলার তীব্র শীতল দৃষ্টির মুখে তাকিয়ে থাকতেও আমার কষ্ট হচ্ছিলো। বারবার শুধু মনে পড়েছিল মাসুদের মায়ের কথা, আমার ৭১ এর সহযোদ্ধা মাসুদ।

তখন আমাদের দুজনেরই তেরো বছর বয়স। মাসুদরা শহরে থাকতো, পাকবাহিনী ওর বাবাকে মেরে ফেলার পর মা-ছেলে আমাদের গ্রামে আশ্রয় নেয়। প্রতি বাড়িতেই কেউ না কেউ শরণার্থী হিসেবে থেকেছে, আমাদের বাড়িতে উঠেছিল মাসুদ আর ওর মা। প্রথম দিকে ছেলেটা কথা বলতো না তেমন, ভাঁড়ার ঘর ফাঁকা করে মা ছেলে একসাথে থাকতো। মাঝে মাঝে পুকুর পাড়ে গিয়ে ঝোঁপের আড়ালে একলা বসে থাকতো। শহরের নাক উঁচু অহংকারী ছেলে ভেবে আমিও ওকে ঘাঁটাতে যেতাম না।

একদিন ও নিজে থেকেই আমার সাথে কথা বলতে আসলো, প্রথম কথাই ছিল, 'তোমার কি মনে হয়না, আমাদেরও যুদ্ধে যাওয়া উচিত?' ভারী আজব ছেলে তো। এতদিন এক বাড়িতে থেকেও কথা বলেনি আর এখন প্রথম বাক্যেই যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তাব। আমি অবশ্য এক মুহূর্তও না ভেবে ওকে হ্যাঁ বলে দিয়েছিলাম, নয়তো কাপুরুষ প্রমাণিত হতে হয়। ঐদিন রাতেই মাসুদ আর আমি বাড়ি ছেড়ে পালালাম। সে জঙ্গলের ভিতর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের খবর পেয়েছিলো কীভাবে ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন।

আমরা যেদিন পালাই তখন ঘোর বর্ষাকাল। সারাদিন বৃষ্টি হয়ে মাটির রাস্তাভর্তি প্যাচপ্যাচে কাদা। বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার ছিল, ফিনকি দেয়া জ্যোৎস্নার আলোয় সবকিছু দেখে আমার কেমন যেন করছিলো বুকের ভিতর!

সেই থেকে বন্ধুত্ব শুরু মাসুদের সাথে। ছেলেটা কথা কম বলতো সত্যিই, কিন্তু কি ভীষণ আন্তরিক ছিল। কতবার ক্যাম্পের পোকাওয়ালা রুটি দুজন ভাগ করে খেয়েছি, কতবার গুলির বাক্স টানতে গিয়ে দুজন কাদায় পড়েছি তার ঠিক নেই। ও কথা দিয়েছিলো যুদ্ধ শেষে ওদের বাসায় নিয়ে যাবে। ওর নাকি রেডিও, গ্রামোফোন, ক্যাসেট প্লেয়ার আর অনেক গল্পের বই ছিল। সেসব দেখানোর কথা বলতো মাঝে মাঝে। ওর বাবা কীভাবে মারা গেলো, সেটা শুধু কখনো বলতো না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম একবারই, ও বলেছিলো, ওই স্মৃতি ভাবতে চায়না ও, ওর ইচ্ছে করে জীবিত বাবার কথা মনে রাখতে। কখনো কখনো ওর বাবার গল্পও করতো, উনার সংগ্রহে নাকি প্রচুর বই ছিল, মাসুদের বই পড়ার অভ্যাস এসেছিলো ওর বাবার কাছ থেকেই।

যেদিন অপারেশনে তারেক ভাই গুলি খেয়ে মারা গেলেন, সেদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলো ও। যদি ও মরে যায়, তাহলে ওর মা কত দুঃখ পাবে সেটা বলছিলো বারবার। কমান্ডার সেদিনও ওকে মায়ের সাথে দেখা করতে যাওয়ার পারমিশন দিতে পারেননি। গ্রামের ভিতর তখন রাজাকারদের ভীষণ দৌরাত্ম্য।

নীরব ন্যায়

মেঘলা বিশ্বাস মনা

কলেজ নং- ৮১৪৬

নবম, বিজ্ঞান-খ

বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা

সকালের উষ্ণ রোদ। বারান্দায় বসে, হাজারো প্রশ্নের মাঝে উত্তরের খোঁজে। সকাল ৮ টা কি ৯ টা বাজে। হাতে গরম চা, পায়ের উপর পা।
চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে মনে হলো চায়ে চিনি মেশানো হয়নি।

- আরেহ! এই বয়ামটা কোথায় আবার?
- রিমঝিম এই রিমঝিম! চিনির বয়ামটা কোথায়?
- কী সাহেব? ক্যান? চিনি তো আগেই মিলাইয়া দিছি। বয়াম দিয়া কী করবেন?
- কী, কেন করেছো?
- ওহ, বয়ামডা পাইতাছিলাম না। তাই আর কি।
- Such a useless fellow!
- কী? কী ফেলবাম?
- আঃ কিছু না। যাও তুমি।

বেশ বিরক্ত হয়ে চা টা না খেয়েই বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

অবাক হচ্ছেন? অবাক হওয়ারই কথা, অবাক না হলেই বরং আপনাকে পাগল ধরা হবে। যে লোকটি চা না খেয়ে বেড়িয়ে পড়লেন, তিনি সমরজিৎ চক্রবর্তী। তবে সবাই তাকে স্যাম বলেই ডাকে।

বেশ বড় মাপের ডিটেকটিভ। তবে, তার পেশার সম্মান রক্ষার্থে বছরে তিনি কেবল তিন বারই কেস সলভ করেন। ছোট থেকেই ধাঁধা সমাধানের অভ্যাস ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে তিনি এই পেশা বেছে নিয়েছেন। বেশ অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ।

এইতো কিছুদিন আগে তার এই বছরের প্রথম কেস সলভ করলেন। তিনি বেশ হিসাবিও বটে। এই নিয়ে তাকে ছয়বার বলেছি– একই কথা।

-স্যার, আপনি যত কেস সলভ করবেন, তত আপনার অভিজ্ঞতা বাড়বো। আপনার চাহিদা ও বাড়বো

কোনো বারই তিনি বিরক্ত হননি। শুধু তাকিয়ে একটা কথাই বলেছেন–

- A wise man don't have to show his wisdom all the time. But, a fool like you will never understand.

অবাক হলেন! ভাবছেন, এমন কথা একবার শুনলে তো তাকে দ্বিতীয় বার বলার কথা না। তবে জ্যোতিষী বলেছেন আমাকে, সাত আমার লাকি নম্বর। যদি আমি কোন কিছুতে ব্যর্থ হই, তাহলে হাল না ছেড়ে চেষ্টা চালাতে। ঠিকই আমি সপ্তম বার ফলাফল পাব।

ঠিক যেমন- অষ্টম শ্রেণিতে ছয়বার ফেল করলেও সাত বারের সময় পাস করে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। তা আবার বেশ বড় কাহিনি।

ওহ! সকালের ঘটনা। তা নিয়ে তো বললামই না।

আগেই বলেছি, তিনি বেশ খুঁতখুঁতে স্বভাবের। যেই বয়াম নিয়ে তিনি রিমঝিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তা খয়েরি রংয়ের। সেখানে তার পছন্দের মাপ মতো সুগার কিউবস থাকে। তা ছাড়া তিনি চা খান না।

এই নিয়ে রিমঝিমকে যে কতবার বলেছি, বুঝিয়েছি- স্যারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না যেতে। কেননা, তার ইচ্ছাগুলোই তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আর রিমঝিম তোড়...

ট্রিং ট্রিং

ওহ, মনে হয় তিনি এসে পড়েছেন।

- কী? তুমি কী আবার নিজের সাথে কথা বলা শুরু করেছ?

- কই স্যার, না তো।
- তা, আমি কি ভুল বললাম? উঠে পড়লে কেন? বস।
- স্যার, এবার ন্যায়টা কাকে দিলেন?

প্রশ্নটি শুনে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর তার কিছুক্ষণ পর আনমনে বলতে শুরু করলেন-

- আজ তো সম্মানও টাকা থাকলে পাওয়া যায়, আর ন্যায় তো আরো পরের কথা। আজ সবাই আমাকে নায়ক ভাবছে। আদালতে আমার প্রমাণ আর সাক্ষ্যের জোরে নামী ব্যবসায়ী আভিষেক ব্যানার্জি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়েছেন। নিজের ছেলের খুন করতে বুক কাঁপেনি তার। অবশ্য, তার ছেলে বা পশুর থেকে কম কোথায়? তাকে মানুষ বললে ভুল নয় বরং পাপ হবে। দুই মাস আগেই তো ওই আরিফ এক ছোট মেয়ের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। তখন আইন টাকার কাছে হেরে গিয়েছিল। কিছু করতে পারেনি। শালা! মরেছে ভালোই হয়েছে।
- তা, কী নিয়ে আফসোস করছেন?
- আফসোস? আমি? আমি এমন কিছুই করিনি যাতে জীবনে আফসোস করতে হয়। সব সময় নিজের মনের কথা শুনেছি কারণ, মন চাইলেই সব সম্ভব। কিন্তু, আমি এবার চেয়েও পারিনি।
- তাহলে,আপনি ব্যর্থ কোথায়?
- আজ মানুষ আমাকে সাধুবাদ দিচ্ছে। তবে আমি জানি, আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমি দেখি একজন খুনিকে।
- তাহলে খুনটা আপনিই করেছেন।
- তা! কী করতাম? এক নরপিশাচ রাস্তায় স্বাধীনভাবে ঘুরছিল। ঘুরতে দিতাম? ঐদিন সবাই বুঝতে পেরেছিল আসল দোষী ওই-ই। কিন্তু টাকার কাছে সত্য চাপা পড়ে গিয়েছিল। তাই, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। শেষ করে দিব ওকে আর পরে যখন ওর কেস-ই হাতে এল, তখন এমন ভাবে সব প্রমাণ সাজালাম যাতে সবার চোখে আভিষেক-ই আরিফের খুনের দোষী হয়। গাছের পাতা তো গাছেরই অংশ।
- বেশ তবে। এখন দোষ কোথায়?
- আমি রক্ষা করেছি এক জীবন, কিন্তু হারিয়েছি নিজের শান্তি। ন্যায় টাকায় কেনা যায় না। আর, প্রতিশোধও নিখুঁত হয় না, শুধু হাড়ে হাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

তাকে আর কিছু বললাম না। একা থাকতে দিলাম।

যে মেয়ের জন্য তিনি এমন করেছেন, সে আর কেউ নয় রিমঝিমের ছোট বোন। তিনি ঠিকই বলেছেন, প্রতিশোধ নিখুঁত হয়না, শুধু হাড়ে হাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। যদি সোজা আঙুলে ঘি না উঠে, তবে আঙুল তো বাঁকা হবেই। ভাবতেই তো পারেন তিনি খুনি, নাকি সত্যিই ন্যায়ের যোদ্ধা। তবে ন্যায়বিচার যখন নীরব থাকে, তখন নরপিশাচকে দমন করাও এক ধরনের ন্যায়। তাই নয় কি?

স্বপ্ন দেখার সাহস

রূপকথা বিশ্বাস
কলেজ নং- ১৮৬৭
একাদশ, বিজ্ঞান-ঙ
বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শাখা

স্বপ্ন এক জাদুকরী শব্দ । এই ছোট্ট শব্দটাই মানুষকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে শেখায়, সমুদ্র পাড়ি দিতে শেখায়, আর অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। কিন্তু আজকাল, আমরা যেন ধীরে ধীরে স্বপ্ন দেখা ভুলে যাচ্ছি।

ছোটবেলায় আমরা সবাই স্বপ্ন দেখতাম কেউ হতে চাইতো ডাক্তার, কেউ পাইলট, কেউ আবার শিল্পী। কিন্তু বড় হতে হতে সমাজ, পরিবার, এবং বাস্তবতার চাপ আমাদের স্বপ্নগুলোকে 'অবাস্তব' বলে তিরস্কার করে দেয়। আমরা তখন নিরাপদ পথ বেছে নিই, ঝুঁকি এড়িয়ে চলি, আর নিজের ভেতরের আগুনটাকে নিভিয়ে ফেলি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো যে মানুষ স্বপ্নহীন, সে আসলে বেঁচে আছে তো? জীবন তো শুধু শ্বাস নেওয়া নয়; জীবন মানে হলো অনুভব করা, চেষ্টা করা, হেরে গিয়ে আবার উঠা। যে মানুষ স্বপ্ন দেখে, তার চোখে ক্লান্তি নয়, আশার আলো জ্বলে। অনেকে ভাবে, স্বপ্ন দেখা মানে বড় কিছু চাওয়া। আসলে না। স্বপ্ন মানে নিজের ভেতরের বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলা। আমি পারবো, আমি কিছু আলাদা করতে পারবো, আমি পৃথিবীতে নিজের চিহ্ন রেখে যাবো। একজন পথশিশু যখন ভাবে একদিন স্কুলে পড়বে সেটাই স্বপ্ন। একজন কৃষক যখন ভাবে এবারের ফলন ভালো হবে সেটাই স্বপ্ন। আর একজন তরুণ যখন ভাবে নিজের মতো করে পৃথিবীটাকে একটু বদলাবে সেটাই তো সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। তাই, স্বপ্ন মানেই শুধু আশা নয়; স্বপ্ন হলো সাহস, পরিশ্রম আর বিশ্বাসের অন্য নাম। যে স্বপ্ন দেখে, সে জানে ব্যর্থতা শেষ নয়, এটা কেবল এক নতুন শুরু। এই বিশ্বাসটাই মানুষকে আবার দাঁড়াতে শেখায়। জীবনে যদি সত্যিই এগিয়ে যেতে চাও, তবে প্রথমে স্বপ্ন দেখতে শেখো, কারণ প্রতিটি বড় অর্জনের শুরু হয় একটি ছোট স্বপ্ন থেকে।

স্বপ্ন দেখতে ভয় পাওয়া ঠিক নয়। কারণ ইতিহাসের প্রতিটি সফল মানুষের শুরুটা হয়েছিল একটিমাত্র স্বপ্ন থেকে।

স্বপ্নই মানুষকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেয়, পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়াতে শেখায়। তাই, যদি কেউ বলে "তোমার স্বপ্ন অবাস্তব" হাসো। কারণ স্বপ্ন যত বড় হয়, ততই তার শক্তি বেশি হয়। আর মনে রেখো, যে মানুষ নিজের স্বপ্নে বিশ্বাস রাখে, সে একদিন অন্যদেরও বিশ্বাস জাগাতে পারে। আর যদি কখনো মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলেছো তাহলে চোখ বন্ধ করে নিজের ছোটবেলার সেই স্বপ্নটার কথা মনে করো, যে স্বপ্নটা তোমাকে হাসাতো, সাহস দিতো, সামনে টেনে নিতো। কারণ সেই স্বপ্নই তোমার আসল পরিচয়, যার ভেতর লুকিয়ে আছে তোমার শক্তি, তোমার গন্তব্য, আর তোমার নিজের সত্য। স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরো, কারণ যে মানুষ স্বপ্ন দেখে, সে কখনো পরাজিত হয় না সে কেবল অপেক্ষা করে নিজের সময়ের।

একটি গাছ একটি প্রাণ

সাদ বিন আকবর
কলেজ নং- ৭১৮২
দশম, বিজ্ঞান-খ
বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা

অন্ধকার রুম। হঠাৎ একটি ভারী কণ্ঠ ভেসে আসে। কেউ সাদিককে ডাকছে। সাদিক চোখ মেলে কাউকে দেখতে পায় না। হঠাৎ সে একটি আলোকরশ্মি দেখতে পায়। কৌতূহলবশত সে তা অনুসরণ করে।

'এদিকে এসো সাদিক।' ঘন জঙ্গলের মাঝখানে এক ভাঙা বাড়ি। তার সামনে বিশাল বড় বটগাছ। সেখান থেকেই কণ্ঠ ভেসে আসছে।

'কে? কে ওখানে?' সাদিক ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করে। এমন ভাব করছ যেন দেখতে পাচ্ছ না। আমি এই যে বটগাছ। ভালো করে শোন, আমি এই তোমাকে বন্দি করেছি এবং খুব শীঘ্রই তোমাকে মারা হবে। বলো তোমার শেষ ইচ্ছে কী?

'কিন্তু আমি কী করেছি?' কাতর গলায় সাদিক জিজ্ঞাসা করে।

'কী করোনি তুমি, তোমরা। তোমরা মানুষরা আমার আমাদের বংশকে নির্বংশ করে দিচ্ছো। আমিও এখন তাই করবো। তখন তোমার বাবা-মা একলা থাকার মজা বুঝবে।'

'আমি কীভাবে তোমার বংশ ধ্বংস করছি? আর তোমার বংশই বা কোথা থেকে এলো'

'আমার বংশ! এমনভাব করছো যেন কিছুই জানো না। তোমরা যেভাবে গাছ কাটছো তাতে আমার কত বংশধর মারা যাচ্ছে। শোনো, বট গোষ্ঠীর মধ্যে দুটি বংশ এক কাঁঠাল বট গাছ ও দুই জিরা বটগাছ। তোমরা অর্থাৎ কাঁঠাল বট বংশের সবাইকে মেরে ফেলছো। এইতো ওইদিন আমার বড়দাদাকে কেটে ফেললা। তোমরা মানুষেরা কত বোকা আর অকৃতজ্ঞ! যার থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস পাচ্ছো তাকেই ধ্বংস করে ফেলছো। আমরা তোমাদের অক্সিজেন দিতাম, ছায়া দিতাম, আর তোমরা আমাদেরকেই মেরে ফেলছো।'

সাদিক আবার কাতরস্বরে বললো, 'কিন্তু আমি কি করেছি?' বট গাছ বললো, 'তোমরা এক থেকে শুরু করেছিলে গাছ কাটা আমিও এক থেকে তোমাদেরকে ধ্বংস করা শুরু করবো। আবার তোমরা যখন আস্তে আস্তে গাছকাটা বন্ধ করবে, আমিও তোমাদের মারা বন্ধ করে দিবো। আর কথা বাড়িয়ো না।' এই বলে গাছটি সাদিককে মারতে গেলো।

হঠাৎ করে সাদিকের ঘুম ভেঙে গেছে। আজ তার বাবার নতুন ফ্যাক্টরির কাজ শুরু করার কথা, বিশাল গাছটা তাই কাটা হবে। তখন হঠাৎ সাদিকের মনে পড়লো সেই কথা, এক থেকে যেভাবে তোমরা গাছ কাটা শুরু করেছ তেমন আমরাও এক থেকে শুরু করবো। তবে কি একটি গাছের বিনিময়ে আমরা একটি প্রাণ হারাচ্ছি!

সে দিনের কথা

সামাইতা জামান খান
কলেজ নং- ৭১৭৮
নবম, বিজ্ঞান-খ
বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শাখা

দেখতে দেখতেই, ৩ বছর ৮ মাস পেরিয়ে গেল। ৩ জানুয়ারি, ২০২২। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণির নবীনবরণ অনুষ্ঠান-২০২২। প্রথমবারের মত রাজউকিয়ান হয়ে প্রবেশ করি স্মৃতির আঙ্গিনায়, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে। কে জানত, আমার অজানা এই জায়গা একদিন হয়ে উঠবে আনন্দের কারখানা। স্মৃতির কর্মশালা। জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। রুম ৩০০৩ থেকে আজ দাঁড়িয়ে ৩০৫ এ। জুনিয়র বিল্ডিং থেকে সিনিয়র বিল্ডিং। ১৩৩৫ দিনে ১৩৩৫টি স্মৃতি। ষষ্ঠ শ্রেণির সেই অবুঝ আমি আজ দাঁড়িয়ে সাইন্স-কমার্সের ভবিষ্যৎ যুদ্ধে। টিফিনের ফাঁকে ফাঁকে বাস্কেটবল নিয়ে তুমুল কাড়াকাড়ি। অথচ বাস্কেটবল হাতে ড্রিবলিং করায় আজ বছর মোটামুটি। কোন এক সময় এই কয়েক ড্রিবলিং এর জন্য টিফিন খাওয়া নিয়ে ছিল তর্কাতর্কি। কারো যেত ২ টা শুট, কারো আবার ৫ টা ; টিফিন শেষে দেখা যেত আমার খালি খাতা। টিফিন শেষে সেই লাইব্রেরি ক্লাস, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ; সবই আজ এক স্মৃতি কেবল।

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। আন্তঃশিফট বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা- জুনিয়র গ্রুপ। চ্যাম্পিয়ন (২-৪), বাংলা মাধ্যম- প্রভাতি শাখা। অথচ আমার বাস্কেটবল আজ পরে আছে হয়ত খাটের কোন এক কোণায়। প্রায়ই দেখতাম বড় ভাইয়া আপুদের শিক্ষাসফর এর বাস বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভাবতাম, কী হয় এই সফরে, কী বা করে সবাই সেইখানে গিয়ে; যতক্ষণ না নিজের সময় এলো সেই বাসের যাত্রী হওয়ার।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। সপ্তম শ্রেণির শিক্ষাসফর। প্রথমবারের মত একত্রে কাটানো সেই আনন্দঘন সময়। বন্ধুদের আড্ডা, নাচানাচি , খেলাধুলার মাঝে দুলনায় দুলতে দুলতে কখন নেমে পরার সময় হয়ে গেল, টেরই পেলাম না।

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। শিক্ষাসফর ২। দেখতে দেখতে পুনরায় বাসে উঠার সময় হয়ে গেল । কিন্তু এইবার চেহারাগুলো ঠিকই এক, কিন্তু মানুষগুলো যেন অন্য । ভ্রমণটা ঠিকই নতুন কিন্তু মুহূর্তগুলো যেন আলাদা। সবই আগের মত কিন্তু সবকিছুই যেন ভিন্ন ।

সকলে ঠিকই বলে, কাটানো সময়গুলো কখনোই ফিরে পাওয়া যায় না। হোক সেটি বন্ধুদের মাঝে আড্ডা কিংবা বন্ধুত্ব, সবই আজ বিলুপ্তপ্রায়। সময় ও বয়সের সাথে সাথে নিজেকেও বদলাতে হয়। সময় কখনো থেমে থাকে না। চলতে থাকে আপন গতিতে। শুধু রয়ে যায় তো ডাইরিতে লিখে রাখা মুহূর্তগুলো। ক্যামেরায় বন্দি করে রাখা ছবিগুলো। প্রতিটি মুহূর্ত ও সময়ের মূল্য তা স্মৃতি হয়ে গেলেই বোঝা যায় । পার হওয়া সেই দিনের কথা এক সময় স্মৃতি হিসেবে ধরা দেয়। ক্ষণিকের এ জীবন পর মুহূর্তেই হয়ে যায় স্মৃতি। স্মৃতির খাতায় আজও লিখিত প্রথম বাস্কেটবল খেলা। প্রথমবার বন্ধুদের সাথে আড্ডা। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম সেমি ফাইনালিস্ট টিম 'ছাড়পত্র'। ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ক্লাস এ 'the Great Wall Of China'। ট্যালেন্ট শো-২০২৫ এ উপস্থাপনা । কখনো "পাশের বাসার ভাবি" হিসেবে বাস্তবতা তুলে ধরা, তো কখনো পরিবেশকর্মী হিসেবে সকলকে সাহায্য করা। সুরাঙ্গনে কাটানো নাটকীয় সময়। কিংবা দিনশেষে জুনিয়র বিল্ডিং এ হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে ব্যস্তহীন প্রহর। প্রতিটি করিডরে রেখে আসা সেই স্মৃতিগুলো।

হয়তো আর কখনো ফিরে পাবোনা সেই তিনটি বছর। হয়তোবা আর ফিরে তাকাবেনা সেই দিনগুলি।

লাল গ্রহের দিনগুলি

আহনাফ তাহমিদ অর্ণব
কলেজ নং- ৭২০৫
নবম, বিজ্ঞান-গ
বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শাখা

আঠারো নভেম্বর দুই হাজার বত্রিশ। স্পেস শাটল এর ভেতর বসে আছি। গন্তব্য—লাল গ্রহ মঙ্গল! আমার চারপাশে স্পেস শাটল এর নানা যন্ত্রের শব্দ। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে তারা। আমার বুক ধকধক করছে, এটা আমার জীবনের সেরা অভিযাত্রা, এটাইতো ছিলো আমার ছোট বেলার স্বপ্ন। আজ তা বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। আমাকে টানা নয় মাস এই স্পেস শাটলে ভ্রমণ করতে হবে।

আজ আঠারো জুলাই দুই হাজার তেত্রিশ। কাকতালীয় হলেও আমার জন্মদিন আজ। দীর্ঘ নয় মাসের মহাকাশ জার্নি করার পর মঙ্গলগ্রহে পৌঁছেছি। স্পেস শাটল এর দরজা খুলে আমি নামলাম মঙ্গলের মাটিতে। সাথে রয়েছে আমার সঙ্গী রোভার পার্সিভারেন্স। চোখে পড়ল লাল ধুলায় ভরা এক নির্জন পৃথিবী। চারদিকে পাথুরে মরুভূমি, কোনো গাছ নেই, কোনো নদী নেই, শুধু ধুলা আর ধুলা। আমি স্পেস স্যুট পরে সাবধানে হাঁটা শুরু করলাম। অবাক হয়ে দেখলাম- এখানে হাঁটার অনুভূতি একেবারেই আলাদা।

আমি মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করলাম এবং সুরা আর-রহমানের অর্থ মনে আসতে লাগলো- অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম এবং নাসায় আমার উপস্থিতির তথ্য পাঠালাম। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, যা পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অদ্ভুত সুন্দর এই লাল গ্রহটি, যার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর অর্ধেকেরও কম, তাই আমি ছোট ছোট লাফ দিলেও অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। টিকে থাকতে হলে এখানকার কম অভিকর্ষ বল, পাতলা কার্বন ডাই অক্সাইড-সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল, বিকিরণ ও প্রচণ্ড ঠান্ডা, এবং দীর্ঘ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিকে মাথায় রাখতে হবে।

সেই সাথে অতীব জরুরি স্পেস স্যুট। যেটা ছাড়া টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। প্রথমেই আমি একটি ছোট ঘাঁটি তৈরি করলাম। সেখানে অক্সিজেন জেনারেটর বসালাম, যা মঙ্গলের বাতাস থেকে অক্সিজেন তৈরি করতে পারে। রোভার পার্সিভারেন্স এর সহায়তায় মাটি খুঁড়ে পরীক্ষা শুরু করলাম। কিছু জায়গায় বরফ জমে আছে। আমি খুশি হলাম, কারণ বরফ গলালে পানি পাওয়া যাবে। পানিই জীবন-এটা পেলে মানুষ একদিন সত্যিই এখানে থাকতে পারবে। তবে সমস্যা একের পর এক দেখা দিল। আমার অক্সিজেন ট্যাঙ্ক সীমিত, তাই সাবধানে ব্যবহার করতে হলো। দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম, রাতে আবার হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। হঠাৎ দেখি আকাশ অন্ধকার হয়ে প্রবল ধুলোর ঝড় শুরু হলো। ঝড়ের ধুলা ঢেকে দিল আমার সৌরবিদ্যুৎ যন্ত্র, বিদ্যুৎ চলে গেল। বিদ্যুৎ ছাড়া ঘাঁটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ আর যোগাযোগ ব্যবস্থা সব বন্ধ হয়ে যাবে। আমি দ্রুত ব্যাকআপ জেনারেটর চালু করলাম। ঘন্টার পর ঘণ্টা ঝড় চলল, তবুও হাল ছাড়িনি। কয়েকদিন পর আমি এক আশ্চর্য আবিষ্কার করলাম। রোভার পার্সিভারেন্স মাটি খুঁড়ে নমুনা সংগ্রহ করছিল। সেই নমুনায় আমি অতি ক্ষুদ্র অণুজীবের ফসিল বা চিহ্ন পেলাম। যদিও তারা জীবিত নয়, তবু এ প্রমাণ দেয় যে মঙ্গলে একসময় জীবন ছিল।

আমার মনে হলো- এই গ্রহটা হয়তো একদিন সবুজে ভরে উঠবে, মানুষও এখানে বসবাস করবে। আমি পৃথিবীতে বার্তা পাঠালাম- "হ্যাঁ, মঙ্গলে জীবনের সম্ভাবনা আছে।" এছাড়াও মাটি পরীক্ষা করে দেখলাম, মঙ্গলের মাটিতে আলু ও গমের মতো ফসল সামান্য পরিমাণ জন্মাতে পারে। সেই সম্ভাবনা থেকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া আলু ও গমের বীজ লাগালাম পরীক্ষার জন্য। ধীরে

ধীরে চারা সবুজ হয়ে উঠল। আমি বুঝলাম, ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা যদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখানে কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তবে মঙ্গলে বসবাস করা অসম্ভব নয়। তবে প্রতিটি মুহূর্তে বিপদ ছিল। যদি অক্সিজেন শেষ হয়ে যায়? যদি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়? অথবা যদি হঠাৎ কোনো অজানা রোগ ছড়িয়ে পড়ে? এসব ভেবে মাঝে মাঝে ভয় লাগত। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। বরং প্রতিদিন নতুন পরীক্ষা করেছি, ডায়েরিতে লিখে রেখেছি, ছবি তুলেছি এবং তথ্য সংগ্রহ করেছি। যদিও রোভার পার্সিভারেন্স নিয়মিত অগ্রিম আবহাওয়া বার্তার পূর্বাভাস দিয়ে আমাকে সহায়তা করতো। দীর্ঘ নয় মাস পার করেছি মহাকাশে এবং এক মাস হতে যাচ্ছে মঙ্গল গ্রহে। একাকীত্ব আমাকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে। চারদিকে নিস্তব্ধতা, শুধু আমার নিঃশ্বাসের শব্দ। জনমানুষ শুন্য এ গ্রহে এসে আমার পৃথিবীর কথা খুব মনে পড়তে লাগল। বাবা-মায়ের কথা, রাজউক কলেজের বন্ধুদের কথা, কলেজের সবুজ গাছ, নীল আকাশ- সব এখন শুধুই স্মৃতি। ভাবনার মাঝে ডুবে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি ছোট্ট নীল একটি গ্রহ ঝকঝক করছে- আবিষ্কার করলাম ওটা পৃথিবী। আমি আবেগকে সংবরণ করতে পারলাম না। এত দূর থেকেও নিজের ঘরকে চিনতে পারা এক অদ্ভুত অনুভূতি। নাসা আমাকে ২০৩৩ সালে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো এখন পৃথিবী আর মঙ্গল নিকটবর্তী অবস্থান করছে, যদিও তার দূরত্বও নেহাতই কম নয়; পাঁচ কোটি কিলোমিটার! পৃথিবীতে ফেরানোর শেষ চেষ্টা করা হবে আমাকে। কিন্তু তা অনিশ্চিত। সেক্ষেত্রে আমাকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে মঙ্গলের এই বৈরী পরিবেশের সাথে। তবে আমি নিজেকে বোঝালাম, আমি তো গবেষণা করছি মানবজাতির জন্য। জীবন দিয়ে হলেও একদিন হয়তো এই কাজের ফলেই মানুষ মঙ্গলে ঘর বানাতে পারবে। খুলে যাবে অপার সম্ভাবনার দুয়ার।

আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম- ঘুম অপেক্ষা নামাজ উত্তম, ঘুম অপেক্ষা নামাজ উত্তম। ফজরের আজান কানে আসছে। অবাক হলাম। আমি কি ঠিক শুনছি! পৃথিবীতে ফজরের আজানে ঘুম থেকে উঠতাম। সালাত আদায় করতাম। কিন্তু মঙ্গলে? এটা কীভাবে সম্ভব? নাকি আমার নিছক কল্পনা?

মা এসে আমাকে আলতো করে ডাকলো। বুঝতে পারলাম ঘটে যাওয়া সবই আমার ঘুমের ঘোরের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এই স্বপ্ন আমাকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, বড় হয়ে আমি সত্যিই মহাকাশ বিজ্ঞানী হব, একদিন রকেটে চড়ে মঙ্গলগ্রহে যাব। হয়তো একদিন আমার স্বপ্নই হবে পৃথিবীর মানুষের বাস্তব ভবিষ্যৎ।

তুলির ছোঁয়ায় জাগ্রত স্বপ্ন

সৃষ্টি সাহা

কলেজ নং: ৭২৪২

নবম, বিজ্ঞান-গ

বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শাখা

ময়মনসিংহের ছোট্ট এক গ্রাম সন্তোষপুর। সন্তোষপুরের সবুজ ধান খেত আর মাটির গন্ধে বেড়ে উঠছিল রিতু। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি অদম্য টানে সে ঘরের মেঝে, মাটির দেয়াল, ভিজে মাটির ওপর আঁকিবুঁকি জুড়ে দিত।

বাবা দিনমজুর, মা গৃহিণী হওয়ায় মা-বাবার দারিদ্র্যতার কারণে রং তুলি দিয়ে আঁকার সৌভাগ্য রিতুর ছিল না। সংসারের দুবেলা খাবার খরচ জোটানো যেখানে ছিল সংগ্রাম, সেখানে রং তুলি কেনা ছিল তাদের কাছে বিলাসিতা। তবু থেমে থাকেনি রিতু। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন ফুলের পাঁপড়ি,গাছের পাতা ইত্যাদির সাহায্যে সে রং তৈরি করত এবং সেটি দিয়ে আঁকতো নিজের বর্ণিল পৃথিবী। স্কুলের অন্যান্য ছেলে মেয়েরা যখন খেলাধুলায় ব্যস্ত, ছোট্ট রিতু তখন ভাঙ্গা মাটির পাত্রে রাখা নিজের রং দিয়ে আঁকিবুঁকিতে ব্যস্ত থাকতো। তখন থেকেই রিতুর স্বপ্ন ছিল নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রামে একটি আর্ট স্কুল খোলা, যেখানে গ্রামের শিশুরাও শিল্পের মাধ্যমে নিজের কল্পনা ও আশা প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু সে জানতো এ স্বপ্ন জয়ের পথ তার জন্য সুগম হবে না। আশেপাশে নানা লোকের নানা কথায় ধীরে ধীরে রিতু আশাহত হয়ে পড়তে শুরু করে। বিশেষ করে তার সহপাঠীরাও তার সীমিত উপকরণ নিয়ে তার সাথে উপহাস করতে শুরু করে।

এমন সময় রিতুর শ্রেণি শিক্ষক সুপর্ণা দত্ত বিষয়টি লক্ষ্য করলেন। তিনি রিতুর দারুণ প্রতিভা দেখে চমকে উঠলেন, তাকে উৎসাহিত করলেন। সুপর্ণা ম্যাডামই জীবনে প্রথমবারের মতো রিতুর হাতে দোকান থেকে কিনে আনা রং তুলি তুলে দিলেন। একই সাথে তিনি রিতুর অন্যান্য সহপাঠীদের এরূপ আচরণ করতে নিষেধ করলেন।

ধীরে ধীরে রিতু বড় হতে থাকে। সে স্কুলে ও গ্রামের প্রদর্শনীতে অংশ নিতে শুরু করে। গ্রামের মানুষ রিতুর প্রতিভা বুঝতে থাকে। তার শিল্পকর্ম শহরের প্রদর্শনীতে পাঠানো হলে সেখানে অজস্র মানুষ তার শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হয় যায়। ধীরে ধীরে রিতু স্বপ্ন পূরণের দিকে এগোতে শুরু করে। সে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের শিল্পকর্মের ছবি পোস্ট করে। ক্রমান্বয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার নিকট অনলাইন অর্ডার আসা শুরু করে। ছোট থেকে বড় ক্যানভাস, টি শার্ট, ব্যাগ প্রত্যেকটি জিনিস ঋতুর রং তুলির ছোঁয়ায় নতুন রূপ ধারণ করে। এ সকল অনলাইন অর্ডারের অর্থ জমিয়ে রিতু গ্রামে তার নিজস্ব আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। আর্ট স্কুলের নাম দেয় 'রঙের নীড়ে স্বপ্নের উড়ান'। রিতুর আর্ট স্কুলে গ্রামের ছোট্ট ছেলে মেয়েদের কল্পনা ও সৃজনশীলতা স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। একই সাথে রিতু দরিদ্র প্রতিভাবান শিশুদের বিনামূল্যের রং তুলি, খাতা কিনে দিতো। সংগ্রাম, অধ্যবসায় এবং সঠিক সহায়তার সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার মিলিয়ে রিতু তার স্বপ্নকে দিলো বাস্তব রূপ। ছোটবেলার সীমিত উপকরণ দিয়ে আঁকা ছোট ছোট রেখাগুলো হয়ে উঠেছিল তার স্বপ্নের রং। আজ রিতু শুধু একজন চিত্রশিল্পী নয়, একজন উদ্যোক্তা, একজন শিক্ষক এবং সমাজের অনুপ্রেরণা।

অদৃশ্য গ্রাম

মিফতাহুল মুনিয়াত

কলেজ নং- ০৯০৫

অষ্টম, ক

বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা

আরিফ ছোটবেলা থেকেই দাদুর কাছে এক অদ্ভুত গল্প শুনত। পাহাড়ঘেরা এক গ্রাম প্রতি দশ বছর পর পর হঠাৎ এক রাতেই অদৃশ্য হয়ে যায়। মানুষ, ঘরবাড়ি, এমনকি গাছপালাও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। দাদু বলতেন, “মানচিত্রে সব কিছু পাওয়া যায় না, কিছু সত্য চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। আরিফ সাহস থাকলেই তুমি খুঁজে পাবে।”

দাদুর মৃত্যুর পর, আরিফ তার পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে খুঁজে পেল একটি ছেঁড়া মানচিত্র। তাতে লাল কালি দিয়ে লেখা ছিল-অদৃশ্য গ্রাম, শেষ দেখা ২০০৫। কৌতূহল আর ভয় একসাথে কাজ করছিল। বন্ধু মীমকে সঙ্গে নিয়ে সে সেই গ্রাম খুঁজতে বের হলো।

পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাথুরে পথ পেরিয়ে তারা পৌঁছাল একটি ছোট গ্রামে। প্রথম দেখায় গ্রামটি একেবারেই সাধারণ, কাদামাটির ঘর, ধোঁয়া ওঠা চুলা, মাঠে খেলতে থাকা শিশু। গ্রামবাসীরা তাদের অচেনা অতিথিদের কাছে অদ্ভুতভাবে আন্তরিক। হাসি ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনোরকম সাহস জাগল। আরিফ আগ্রহের সঙ্গে ভাবল, এই গ্রাম শুধু অদৃশ্য নয়, তার মধ্যে লুকানো ইতিহাস ও রহস্যও আছে। সেই রাতের পর, তারা গ্রামের ইতিহাস অনুসন্ধান শুরু করল। গ্রামে প্রবেশের পর কিছু জিনিস যেমন দেখেছিল তারা, তেমনই প্রাচীন এক মন্দির, যেখানে অদ্ভুত চিহ্ন ও প্রতীক আঁকা ছিল। প্রতীকগুলো দেখে আরিফ বুঝতে পারল, এই গ্রাম শুধু সাধারণ মানুষদের জন্য নয়, বরং একটি লুকানো সভ্যতার অংশ।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা পাহাড়ি জঙ্গল ও গ্রামের চারপাশের অঞ্চল খুঁজে বেড়ালো। তারা নানা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলো-ঝরনা ভেঙে পাহাড়ের ঢাল, হঠাৎ ঝড়ের ভয়ঙ্কর বাতাস, এমনকি কিছু অদ্ভুত ছায়া তাদের পিছু ছাড়ছিল না। কিন্তু আরিফ ও মীম একে অপরকে সাহস দিয়ে এগিয়ে চলল। একদিন, গ্রামের পরিত্যক্ত নদীর ধারে তারা একটি পুরনো নৌকা পেল। নৌকাটি দেখে বোঝা গেল, এটি ব্যবহার করেই গ্রামবাসীরা অদৃশ্য হওয়ার সময় অন্য জগতে চলে যায়। আরিফ অনুভব করল, গ্রামের অদৃশ্যতার রহস্য কেবল ধ্রুব সত্য নয়, বরং এটি সময় ও জগৎকে ছাড়িয়ে যাওয়া এক জাদুকরী পদ্ধতি।

শেষ পর্যন্ত আরিফ ও মীম সিদ্ধান্ত নিল, গ্রামের রহস্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত। তারা শহরে ফিরে এল, কিন্তু মনে রেখেছিল প্রতিটি চিহ্ন, প্রতিটি নথি, প্রতিটি অদ্ভুত ঘটনা। তারা জানত, অদৃশ্য গ্রাম চিরকাল রহস্যময় থাকবে, এবং তারা সেই রহস্যের একমাত্র সাক্ষী।

আরিফ বুকে চেপে ধরল মানচিত্রটি। সে বুঝল, সবকিছু জানা সম্ভব নয়। কিছু জায়গা, কিছু গল্প, চিরকাল মানুষের চোখের আড়ালে থেকে যায়। অদৃশ্য গ্রাম তার মধ্যে সবচেয়ে বড় এক রহস্য, যা কেবল সাহসী মনই বুঝতে পারে।

ভূতের ল্যাবরেটরি

আবুত্যাহি জামান

কলেজ নং- ১০৭৫

সপ্তম-খ

বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শাখা

আমার নাম জামান। আমি রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র, বিজ্ঞান ও রহস্য আমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। আমাদের শহরে একটি গল্প প্রচলিত - পুরোনো শহরের প্রান্তে একটি পরিত্যক্ত বিজ্ঞান ল্যাব আছে। যেখানে রাতের বেলা অদ্ভুত আলো ঝলমল করে এবং ভয়ংকর শব্দ শোনা যায়। সাধারণ মানুষ সেখানে যাওয়ার সাহস করে না। কিন্তু, আমি ও আমার কিছু বন্ধু মিলে সেই ল্যাবে যেতে চাইলাম।

ল্যাবের প্রধান দরজা খানিকটা খোলা ছিল । ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল - পুরোনো যন্ত্রপাতি, ধুলোয় ঢাকা ফ্লাস্ক আর নিচে পড়ে থাকা কাঁচের টুকরা। আমরা একজন অন্য জনের দিকে তাকালাম। ভয় আর কৌতূহল মিশ্রিত অনুভূতি। হঠাৎ ল্যাবের এক কোণে আলো ঝলমল করতে লাগল। আমরা কাছে গিয়ে দেখলাম কম্পিউটার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আর, স্ক্রিনে লেখা ছিল, “ভূতের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা শুরু।”

কম্পিউটার থেকে শোনা গেল, ‘স্বাগতম’ সাহসী পর্যবেক্ষকরা। আমি এই ল্যাবের প্রধান বিজ্ঞানী। যদিও আমি মৃত আমার আত্মা এখনো বেঁচে আছে। তবে আমি শুধু ভালো কাজ করতে পারি। আমি ও আমার বন্ধুদের দেখানো হলো কিভাবে অদৃশ্য বস্তু ভূতের শক্তি দিয়ে দেখা যায়, তিনি বললেন, “আমার গবেষণা ছিল মৃত প্রাণীদের স্মৃতি ধরে রাখা এবং মানুষের আবিষ্কারকে সংরক্ষণ করা।”

এরপর আমরা একটি মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মেশিনটি অতীতের দৃশ্য চিত্র আকারে দেখাতে সক্ষম। আমরা দেখতে পেলাম শহরের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এমনকি গন্ধও অনুভব করা যাচ্ছিল। হটাৎ একটা শব্দ করে উঠলো, সবাই গিয়ে দেখি একটা দরজা। সেটা ভিতর এই ল্যাবের আগের বিজ্ঞানীদের আত্মা। তারা এখনো তাদের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। বাইরে কিছু লোকের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল, আমরা তাড়াতাড়ি মেশিনগুলো বন্ধ করতে থাকলাম। ধীরে ধীরে ল্যাবের আলোও বন্ধ হয়ে গেল। বের হওয়ার আগে প্রধান বিজ্ঞানী বলল, “এই ল্যাবের ভিতরের রহস্য কাউকে বলবে না, তা-না হলে শাস্তি ভোগ করবে” বাইরে এসে বুঝলাম, বিজ্ঞান শুধু আবিষ্কারই শেখায় না, আরও শেখায় দায়িত্ব নিতে?

হ্যাবিটেবল গ্রহ

স্বর্লোক অধিকারী

কলেজ নং: ০৯৫৩

ষষ্ঠ-ক

বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা

গ্রহ কী, তা তো আমরা কমবেশি সবাই জানি। এমনকি আমরাও একটা গ্রহতেই তো থাকি। যেটি হচ্ছে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবীতে মানুষের (Homo Sapiens-মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম) আবির্ভাব হয় প্রায় ৩০০,০০০ বছর আগে। পৃথিবীতে জীবন সম্ভব হয়েছে, কারণ এটি একটি হ্যাবিটেবল গ্রহ (Habitable Planet)। পৃথিবী ছাড়াও এই মহাবিশ্বে রয়েছে কোটি কোটি গ্রহ। এসব গ্রহতে কী জীবন আছে ? এটি সম্ভব হতে পারে যদি সেটি হ্যাবিটেবল গ্রহ হয়। তবে, হ্যাবিটেবল গ্রহ আবার কী?

এই বিষয়টা ভালো করে বুঝতে হলে হ্যাবিটেবল জোন (Habitable Zone) কী, তা জানা প্রয়োজন। এটি একটি সৌর জগতের এমন একটি অঞ্চল বা জোন যেখানে সেই সৌর জগতের তারকার আলো না কম পরিমাণে পৌঁছে, না বেশি পরিমাণে, অর্থাৎ একদম সঠিক ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছে যাতে সেখানে পানির পরিমাণ বেশি থাকতে পারে এবং জীবন জন্মাতে পারে, এমন অঞ্চল বা জোন হচ্ছে হ্যাবিটেবল জোন। সহজ করে বললে কোনো সৌর জগতের এমন জায়গা যেখানে গ্রহ থাকলে সেখানে পানির উদ্ভব হতে পারে। ১৯১৩ সালে প্রথম যিনি হ্যাবিটেবল জোন এর ধারণা দেন তাঁর নাম এডওয়ার্ড মান্দার (Edward Maunder)।

যে গ্রহ হ্যাবিটেবল জোন-এ থাকবে সেটা হবে হ্যাবিটেবল গ্রহ। প্রধানত যিনি হ্যাবিটেবল গ্রহের ধারণা দেন তাঁর নাম জেমস্ এফ. কাস্টিং(James F. Kasting) । তার আগে, ফ্রাঙ্ক ড্রেক (Frank Drake) তার বিখ্যাত ড্রেক সমীকরণ (Drake Equation-1961)-এর মাধ্যমে মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক হিসাব দেন। পরে, নাসা (NASA)-এর কেপলার মিশন (Kepler Mission-2009-2018) কিছু হ্যাবিটেবল গ্রহ আবিষ্কার করে, যা এই তত্ত্বকে বাস্তব প্রমাণে রূপ দেয়।

এমন কি আর কোনো গ্রহ নেই যেটা আমাদের সৌর জগতের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না বা আমাদের সৌরজগতের বাইরে? অবশ্যই আছে। এ ধরনের গ্রহগুলোদের বলে এক্সোগ্রহ (Exoplanet)। আলেক্সান্ডার ওলসজ্যাকজেন (Aleksander Wolszczan) ও ডেল ফ্রেইল (Dale Frail) ১৯৯২ সালে প্রথম এক্সো গ্রহ খুঁজে পান।

জ্যোতির্বিদদের মতে তারা এই পর্যন্ত প্রায় ৬০০০টির মতো এক্সো গ্রহ খুঁজে পেয়েছেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- কেপলার-২২বি (Kepler–22b), যেটি পৃথিবী থেকে ৬২০ আলোক বর্ষ (Light zear) দূরে। আরও আছে, কেপলার-৪৫২বি (Kepler-452b), কেপলার-১৮৬এফ (Kepler-186f), ট্রাপিস্ট-১ই (Trappist-1e), এলএইচএস ১১৪০ বি (LHS 1140 B) এবং আরও অনেক। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কাছে যে এক্সো গ্রহ আছে তার নাম প্রক্সিমা সেন্টারি বি (Proxima Centauri b) যা পৃথিবী থেকে মাত্র ৪.২৪ আলোক বর্ষ দূরে। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের গ্রহ খুঁজে এগুলোর মধ্যে যেগুলো হ্যাবিটেবল গ্রহ, সেগুলোদের নাম দিয়েছে হ্যাবিটেবল এক্সোগ্রহ (Habitable exoplanet)। এই পর্যন্ত মোট ৭০টিরও বেশি এমন গ্রহ পাওয়া গিয়েছে যেগুলো হ্যাবিটেবল এক্সো গ্রহ হতে পারে, যার মধ্যে ২৯টিরও বেশি শিলা-গ্রহ (Rockz Planet) হতে পারে এবং বাকি ৪১টিরও বেশি জলময় গ্রহ (Waterworld) বা ক্ষুদ্র নেপচুন (Mini Neptune) এর মত হতে পারে।

প্রথমে বুঝে নিই যে শিলা গ্রহ কী। শিলা গ্রহ হচ্ছে এমন গ্রহ বা উপগ্রহ যাদের মূল গঠন শিলা (পাথর) বা ধাতু দিয়ে তৈরি, এদের পৃষ্ঠ শক্ত ও কঠিন হয় এবং যদি পানি ও বায়ুমণ্ডল উপস্থিত থাকে তবে জীবন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে (হ্যাবিটেবলও হতে হবে)। আমাদের পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত। আর জলময় গ্রহ নাম শুনেই বোঝা যায় এটি এমন ধরনের গ্রহ যেখানে পানির পরিমাণ বেশি। এখানে পৃষ্ঠের পুরোটা জুড়ে রয়েছে পানি বা বরফ এবং এ ধরনের গ্রহগুলোতে জীবনের সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ, পানিই হচ্ছে জীবনের মূল উপাদান। এগুলোর মধ্যে অন্তর্গত- কেপলার-২২বি (সম্ভাব্য ভাবে জলময় গ্রহ)। এবার একটু ক্ষুদ্র নেপচুন এর মত গ্রহগুলো সম্পর্কেও বুঝে নেই। এমন ধরনের গ্রহ যেগুলোর আকার পৃথিবী থেকে বড়, কিন্তু নেপচুন থেকে ছোট এবং ঘন বায়ুমণ্ডল থাকে (হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম), তাকেই বলে ক্ষুদ্র নেপচুন এর মত গ্রহ। এ-ধরনের গ্রহগুলোর ভিতরে তরল বা বরফময় কেন্দ্র থাকতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- জিজে ১২১৪বি (সম্ভাব্য ভাবে ক্ষুদ্র নেপচুন)।

আচ্ছা, এমনও কি গ্রহ আছে যেগুলো বসবাসের জন্য পৃথিবী থেকেও উত্তম? অবশ্যই আছে। এই ধরনের গ্রহগুলোকে বলা হয় সুপার হ্যাবিটেবল গ্রহ (Super Habitable Planet)। এই পর্যন্ত মোট ২৪টি সুপার হ্যাবিটেবল গ্রহ পাওয়া গিয়েছে (২০২০ সালের গবেষণা অনুযায়ী)। এবার এগুলো সুপার হ্যাবিটেবল কীভাবে, তা জানা যাক। সুপার হ্যাবিটেবল হতে হলে অবশ্যই প্রথমে এটিকে হ্যাবিটেবল জোনে থাকতে হয়। তাপমাত্রা পৃথিবীর তাপমাত্রার চেয়ে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম বা বেশি হতে পারে এবং পানির পরিমাণ বেশি হতে হবে। ভর পৃথিবী থেকে বেশি হতে হবে, আবার অতিরিক্ত নয়। আকার পৃথিবী থেকে বড় হতে হবে। তারকা কে (ক)-ধরনের (অরেঞ্জ ডুয়ার্ফ-Orange Dwarf) হতে হবে, যাতে মানবজাতি নিজেদের উন্নতি সাধন করতে বেশি সময় পায়। বায়ুমণ্ডল ঘন হতে হবে এবং মাধ্যকর্ষণ বল আরও শক্তিশালী হতে হবে যাতে সেই গ্রহে মানবজাতি সহজে ছড়াতে পারে। এগুলোই হলো একটি সুপার হ্যাবিটেবল গ্রহের বৈশিষ্ট্য। সুপার হ্যাবিটেবল গ্রহের প্রথম ধারণা দেন রেনে হেলার (René Heller) ও জন আর্মস্ট্রং(John Armstrong)। এরপর ২০২০ সালে ডির্ক স্কাল্জ মাকুচ (Dirk Schulze-Makuch) সুপার হ্যাবিটেবল গ্রহের খোঁজ শুরু করেন।

এবার, অনেকের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে, এই গ্রহগুলো কীভাবে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে? প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ, টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে(Telescope)। কিন্তু টেলিস্কোপ পৃথিবীতেই আছে, আবার কিছু আছে মহাকাশে। বিখ্যাত কিছু টেলিস্কোপ এর নাম- কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ (Kepler Space Telescope), স্পিটজার স্পেস টেলিস্কোপ (Spitzer Space Telescope), হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (Hubble Space Telescope), জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (James Webb Space Telescope), ট্রাপিস্ট(TRAPPIST) এবং আরো অনেক, যারা হাজার হাজার গ্রহ (এক্সো গ্রহ) খুঁজতে অতুলনীয় সাহায্য করে।

একটি জিনিস কি জানো যে কোনো গ্রহে যে জীবন থাকবে সেটি একদম সঠিকভাবে কীভাবে বোঝা যায়? কোনো গ্রহে যদি ডিএমডিএস (DMDS-DiMethzl DiSulfide) ও ডিএমএস (DiMethzl Sulfide) নামক পদার্থ বেশি পরিমাণে থাকে তবে সেখানে জীবন আছে। কারণ, এটি শুধুমাত্র জীব থেকেই নিঃসরণ বা বের হয় এবং পৃথিবীতে তো এটি আছে, তবে কে-২-১৮বি (ক-২-১৮ন) নামক গ্রহে এই পদার্থ থাকার সম্ভাবনা ৯৯.৭ শতাংশ! যদি সেখানে জীবন পাওয়া যায় তবে সেটি হবে মানবজাতির সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।

এখনো এই মহাবিশ্বে প্রায় সবকিছু রহস্যে ভরা, তবে একদিন সকল রহস্যের পর্দা উন্মোচন হবেই। হয়তো একদিন এই পুরো মহাবিশ্ব হবে আমাদের হাতের মুঠোয়, মানবজাতির হাতের মুঠোয়।

টাইম ট্রাভেল

তায়্যিবা শাহরিন
কলেজ নং- ০৩৩০
ষষ্ঠ-ক
ইংরেজি মাধ্যম, দিবা শাখা

সময়টা ২০২৩ সাল। টোকিও শহরে রুহিনী নামের এক মেয়ে থাকতো। তার ছোট বোন রীতি, মা মিজুহা, আর বাবা আকিহিকো। রুহিনী নবম শ্রেণির ছাত্রী, আর রীতি চতুর্থ শ্রেণির। রুহিনী পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে সে অদ্ভুত সব চিন্তা করতো। ছোটবেলা থেকেই সে শুনে এসেছে, একশো বছর আগে তাদের পূর্বপুরুষদের বাড়িতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সেই বাড়িতে ছিল অনেক গুপ্তধন, যা তাদের বংশগতভাবে পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই ধনের কোনো হদিস নেই। রুহিনীর মনে প্রশ্ন জাগে- সবকিছু কোথায় গেল? কী ঘটেছিল সেই দিন?

বর্তমানে সেই রহস্যের সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই তার মনে টাইম ট্রাভেলের ইচ্ছা জাগে। কিন্তু তখনও বিজ্ঞানীরা টাইম ট্রাভেলের যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। রুহিনী ভাবতো, সত্যিই কি সময় ভ্রমণ সম্ভব নয়?

অনেক বছর কেটে যায়। রুহিনী এখন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করে। টাইম ট্রাভেলের প্রতি আগ্রহ থেকেই সে এই বিষয় বেছে নেয়। সে সব পরীক্ষায় A+ পায় এবং অবশেষে NASA-তে স্পেসশিপ পাইলট হিসেবে যোগ দেয়। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। রুহিনী ভাবে, আলোর গতিতে চললে কি সময় ভ্রমণ সম্ভব? হয়তো সম্ভব, কিন্তু অতীতে যাওয়া নয়- কারণ সময় সবসময় সামনে এগোয়। আর যদি যাওয়া সম্ভবও হয়, ফিরবে কীভাবে?

কিছুদন পর রুহিনীসহ পাঁচজনকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয় মঙ্গলগ্রহে পাঠানোর জন্য। তাদের কাজ ছিল মঙ্গলে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা এবং একটি রোবট স্থাপন করা মানুষের বসবাসের উপযোগিতা যাচাই করা।২৫ জুন, স্পেসশিপটি রওনা দেয়। পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব একেক সময় একেক রকম হয়– কখনো ৫৫ মিলিয়ন, কখনো ৪০০ মিলিয়ন কিলোমিটার। তাদের যাত্রায় সময় লাগে প্রায় ১১ মাস। মঙ্গলে পৌঁছে তারা গবেষণা শুরু করে। তারা দেখে, মঙ্গলের মাটিতে গাছপালা জন্মাতে পারে, কিন্তু আবহাওয়া মানুষের জন্য উপযুক্ত নয়।

ফেরার সময় স্পেসশিপে সমস্যা দেখা দেয়। যাওয়ার সময় কিছু উল্কাপিণ্ডের ধাক্কা লেগেছিল, যা এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। NASA-কে জানানো হয়, কিন্তু হঠাৎ স্পেসশিপ কাঁপতে শুরু করে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্পেসশিপটি পৃথিবীর দিকে নয়, অজানা দিকে যাচ্ছে। রুহিনী বুঝতে পারে, তারা একটি ব্ল্যাকহোল-এর দিকে যাচ্ছে। সে সবাইকে সতর্ক করে, কিন্তু কিছু করার নেই। স্পেসশিপটি ভেঙে যেতে শুরু করে। সবাই বেরিয়ে আসে, কিন্তু রীতি বের হতে পারে না-আগুন ধরে যায়। মহাকাশে গ্রাভিটি না থাকায় সবাই আলাদা হয়ে যেতে থাকে। সুমা একটি বেল্ট বের করে, সবাইকে একসাথে বেঁধে ফেলে।একজন বলে, "এত কিছু করে কি লাভ? আমরা কোথায় জানি না, অক্সিজেনও শেষ হয়ে যাবে।" সবাই প্রার্থনা করতে থাকে।

হঠাৎ তারা এক অদ্ভুত কালো জায়গায় ঘুরতে থাকে। চারপাশ ঘোলা, কিছু একটা দ্রুত গতিতে ঘুরছে। হঠাৎ এক উজ্জ্বল আলো আসে। চোখ খুলে তারা অবাক- তারা পৃথিবীতে! একটি দ্বীপে। তারা সমুদ্রের কিনারে যায়, একটি নৌকা দেখে। মাঝি তাদের দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "এখানে কী করছেন? এখানে তো কেউ থাকে না।" রুহিনী বলে, "আমরাও জানি না, আপনাকে কী বলবো?"

পৃথিবী, কিন্তু অন্যরকম। সবাই বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু কিছুই আগের মতো নেই। রুহিনীর ৪ মাসের বাচ্চা এখন তার চেয়ে ২০ বছর বড়! রীতি মারা গেছে। পৃথিবী এখন রোবট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সবকিছু বদলে গেছে। রুহিনীর হিসাব অনুযায়ী, তারা অনেক দেরিতে ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু এতো যুগ পেরিয়ে গেছে-এটা সম্ভব নয়। শেষ মুহূর্তে কী হয়েছিল, কেউ জানে না।

রুহিনী ফিসফিস করে বলে–

টাইম ট্রাভেল?

স্মৃতির পাতায় ৩৩তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট জাম্বুরি ফিলিপাইন

মোহাম্মদ কায়সার হামিদ প্রিয়ম
কলেজ নং- ১০২১
সপ্তম-গ
বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা

এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট জাম্বুরি হলো এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সবচেয়ে বড় স্কাউটিং ইভেন্ট, যেখানে হাজারো তরুণ-তরুণী আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব, শান্তি এবং নেতৃত্ব প্রকাশ করার জন্য একসাথ হয়। ১ম এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট জাম্বুরি ১৯৭৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ফিলিপাইনের মাউন্ট মাকিলিং-এ অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পর এবারের ৩৩তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয় ফিলিপাইনের জাম্বালেস-এ ১৪ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ স্কাউট গ্রুপ থেকে ১৫ জন স্কাউট এবং একজন ইউনিট লিডারসহ মোট ১৬ জন এই আন্তর্জাতিক জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ করে এবং পুরো বিশ্ব থেকে ১৯টি দেশের ২৪,০০০-এর বেশি স্কাউট এতে অংশ নেয়।

১২ ডিসেম্বর রাতে আমরা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে কলেজের গাড়িতে করে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাই। আমাদের ফ্লাইট ছিল রাত ১১টায়। আমরা ১৩ তারিখ ভোর ৩টায় চীনের গুয়াংজুতে পৌঁছাই। ৪ ঘণ্টার ট্রানজিট শেষে আমরা ১৩ তারিখ সকাল ১০টায় নিনয় অ্যাকুইনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করি। সেখানে ফিলিপাইন বয়স্কাউটসের পক্ষ থেকে আমাদের উপহার দেওয়া হয় এবং তাদের বাসে করে আমরা জাম্বালেস, বোটোলান, কাইনোমায়ান ক্যাম্পে যাই। ৭ ঘণ্টা ভ্রমণের পর আমরা রাতে ক্যাম্প সাইটে পৌঁছাই। সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য ক্যাম্প সাইটটি অনেক সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। বাস থেকে নামার পর ফিলিপাইন স্কাউটরা আমাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানায় এবং আমাদের সাথে অনেক ছবি তোলে। প্রতিটি দেশের জন্য আলাদা সাব-ক্যাম্প ছিল। আমাদের সাব-ক্যাম্পের নাম ছিল ভারগার্স এবং আমাদের ইউনিট নং ছিল ২। আমরা ডিনার করে তাঁবু টাঙাই। তারপর ফ্রেশ হয়ে আমরা নিজেদের তাঁবুতে ২ জন করে ঘুমিয়ে পড়ি।

১৪ ডিসেম্বর ভোরে আমাদের ঘুম ভাঙে। এরপর আমরা বি.পি. পিটি শেষ করে ব্রেকফাস্টের জন্য ক্যাফেটেরিয়াতে যাই। সেখানে ফিলিপাইন বয়স্কাউটদের সাথে আমরা একসাথে নাশতা করি । ফিলিপাইন স্কাউটসদের পক্ষ থেকে আমাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। পুরো দিনটি ফিলিপাইন স্কাউটদের সাথে গল্প করা, সেলফি তোলা এবং স্কাউট ব্যাজ বিনিময়ের মাধ্যমে দারুণভাবে কেটে যায়। এরপর ডিনার শেষ করে আমরা ক্যাম্প সাইটের বড় একটি মার্কেটে যাই, যেটিকে জাম্বো মার্কেট বলা হয়। সেখানে অনেক চমৎকার সব জিনিস দেখতে পাই।

১৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ তৃতীয় দিনটি ছিল আরও বেশি আনন্দদায়ক। সেদিন ছিল ৩৩তম এপিআর জাম্বুরির জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ১৯টি দেশ থেকে আসা স্কাউটরা সেদিন কাইনোমায়ান ক্যাম্পে সমবেত হয়। বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট গ্র্যান্ড অ্যারেনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া এবং কোরিয়ার পর বাংলাদেশ দল গ্র্যান্ড অ্যারেনায় পৌঁছায়। সেখানে ১৯টি দেশের মোট ২৪,০০০ স্কাউটের উপস্থিতি ছিল দেখার মতো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফিলিপাইন বয়স্কাউটসের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও ডেপুটি ক্যাম্প চিফ অ্যাটি এমিলিও বি অ্যাকুইনো, এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কমিটির চেয়ারম্যান ডাটো ড. মোহাম্মদ জিন বিন বিদিন এবং জাম্বালেসের গভর্নর ও ক্যাম্প চিফ হারমোজেনেস ই. এবদান জুনিয়র। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের প্রপৌত্র ডেভিড রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল এবং শার্লট ব্যাডেন পাওয়েল। অনুষ্ঠানের শুরুতে সব দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর আমরা স্কাউট প্রতিজ্ঞা আবৃত্তি করি। এরপর ক্যাম্প চিফ আনুষ্ঠানিকভাবে ৩৩তম এপিআর জাম্বুরির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সবশেষে আমাদের সামনে ফিলিপাইনের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নাচ পরিবেশন করা হয়। এরপর ফিলিপাইন স্কাউটসের বিভিন্ন কাউন্সিল তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য উপস্থাপন করে নাচ-গান পরিবেশন করে। সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল ৩৩তম এপিআর স্কাউট জাম্বুরির থিম সং 'স্কাউটস উই আর ওয়ান'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে বিশাল আকাশজুড়ে বর্ণিল আতশবাজির প্রদর্শনী হয়, যা এই আয়োজনকে আরও মহিমান্বিত করে তোলে।

১৬ ডিসেম্বর দিনটি ছিল আরও বেশি বিশেষ এবং আনন্দদায়ক। কারণ সেদিন ছিল আমাদের বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নাশতা সেরে আমরা অ্যাক্টিভিটি এরিয়াতে চলে যাই। সেখানে ওয়াটার গেমস, রোলিং, মাঙ্কি জাম্পিং, রক স্কিপিং-এর মতো অনেক ধরনের রোমাঞ্চকর খেলা ছিল। এসব খেলায় মেতে থেকে আমাদের সময়টা দারুণ কাটল। এরপর আমরা বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট গ্র্যান্ড অ্যারেনায় যাই এবং পুরো বিশ্বের সামনে আমাদের বিজয় দিবস পালন করি।

১৭ ডিসেম্বর ভোরে উঠে আমরা ফিলিপিনো স্কাউটদের সাথে বি.পি. পিটি করি এবং তাদের সাথে নাচে অংশ নিই। সেদিন আমরা অ্যাক্টিভিটি এরিয়াতে ওয়াটার রোলিং খেলি এবং পুকুরে গোসল করি। দুপুরে লাঞ্চের পর আমরা 'জাম্বো মার্কেট'-এ যাই। রাতে আমরা জাম্বালেসের কয়েকটা জায়গা ঘুরে দেখি এবং ডিনার করে ঘুমিয়ে পড়ি।

১৮ ডিসেম্বর এই দিনটিতে ছিল কালচারাল নাইট। ৩৩তম এপিআর জাম্বুরিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী নাচ এবং গান প্রদর্শনের কথা ছিল। বিকেলের দিকে আমরা গ্র্যান্ড অ্যারেনায় যাই। সেখানে সব দেশের স্কাউটরা তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী পোশাকে উপস্থিত ছিল।থাইল্যান্ড তাদের ঐতিহ্যবাহী মুখোশ পরা নৃত্য 'খোন' এবং 'মুয়াই থাই' মার্শাল আর্টের চমৎকার কোরিওগ্রাফি প্রদর্শন করে। দক্ষিণ কোরিয়া তাদের আধুনিক কে-পপ নাচের সাথে ঐতিহ্যবাহী 'ফ্যান ড্যান্স'-এর একটি মিশ্রণ তুলে ধরে। ইন্দোনেশিয়ার স্কাউটরা পরিবেশন করে 'সামান' ড্যান্স বা হাজারো হাতের তালের নৃত্য, যা ছিল অত্যন্ত সুসংবদ্ধ। বাংলাদেশের স্কাউটরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য এবং লাল-সবুজ পতাকার রঙের পোশাক পরে একটি বিশাল পারফরম্যান্স করে, যা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে। শ্রীলঙ্কা, মঙ্গোলিয়া, ভারত, মালয়েশিয়াসহ আরও অনেক দেশের অসাধারণ সব পারফরম্যান্স উপভোগ করার পর আমরা আমাদের সাব-ক্যাম্পে ফিরে আসি।

১৯ ডিসেম্বর (৭ম দিন) আমরা অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিতে অংশ নিই। আসলে স্কাউটিং মানেই হাতে-কলমে শেখা, আর এই অ্যাক্টিভিটিগুলো থেকে আমরা এমন অনেক কিছু শিখেছি যা আমাদের বাস্তব জীবনে অনেক কাজে লাগবে। এরপর আমরা আইএসটি ক্যাম্প ঘুরে দেখি। বিকেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা পরবর্তী দিনের প্ল্যান করি, কারণ পরের দিন ছিল আমাদের ফুড ফেস্টিভ্যাল এবং সমাপনী অনুষ্ঠান।

২০ ডিসেম্বর ছিল ৩৩তম এপিআর জাম্বুরির সমাপনী অনুষ্ঠান, ফুড ফেস্টিভ্যাল এবং ক্যাম্প ফায়ার। সকালে অ্যারোবিক্স ও গোসল শেষ করে আমরা আমাদের অ্যাক্টিভিটি চার্ট পূর্ণ করি এবং 'অ্যাক্টিভিটি কম্পিটিশন সার্টিফিকেট' লাভ করি। ব্রেকফাস্টের পর ফিলিপাইন স্কাউটসের পক্ষ থেকে আমাদের জাম্বুরি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এরপর শুরু হয় 'ফুড ফেস্টিভ্যাল'। আমরা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খাবার সবার সামনে তুলে ধরি। সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে আমাদের খাবারগুলো উপভোগ করে। উৎসব শেষে রাতে আমরা আবারো লাল পাঞ্জাবি পরে সমাপনী অনুষ্ঠানের জন্য গ্র্যান্ড অ্যারেনায় যাই। ক্যাম্প ফায়ারে আগুন জ্বালানোর মাধ্যমে সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল 'গ্র্যান্ড ক্যাম্পফায়ার'। ১৯টি দেশের স্কাউটরা একসাথে বিশাল আগুনের চারপাশে বসে 'স্কাউট স্পিরিট' শেয়ার করে এবং বিদায়ী গান গায়। জাম্বুরির থিম সং বেজে ওঠার সাথে সাথে পুরো অ্যারেনা নাচতে শুরু করে এবং আকাশে বর্ণিল আতশবাজি ফোটানো হয়। আনন্দের মাঝেও সবার মনে কিছুটা দুঃখ ছিল, কারণ এটিই ছিল আমাদের শেষ দিন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এপিআর পতাকাটি ফিলিপাইনের পক্ষ থেকে থাইল্যান্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়, কারণ ৩৪তম এপিআর জাম্বুরি (২০২৯) থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে । ফিলিপাইন স্কাউটরা যখন আমাদের বিদায় দিচ্ছিল, তখন পরিবেশটা খুব আবেগঘন হয়ে ওঠে। আমরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আমাদের বন্ধুদের বিদায় জানাই এবং তারা আমাদের অনেক উপহার দেয়।

২১ তারিখ ভোর ৬টায় আমাদের ক্যাম্প সাইট থেকে চলে যাওয়ার কথা ছিল। আমরা আমাদের সব কিছু গুছিয়ে বাসে উঠে পড়ি। ফিলিপাইন বয়স্কাউটরা আমাদের বিদায় জানায়। সাব-ক্যাম্প হতে আমরা ম্যানিলার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। ৭ ঘণ্টা পর আমরা ম্যানিলার একটা স্কুলের সামনে পৌঁছাই। ম্যানিলাতে আমরা আরও ৪ দিন ছিলাম। তারপর ২৫ তারিখ সকালে আমরা নিনয় অ্যাকুইনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাই। আমাদের ফ্লাইট ছিল দুপুর ১২টায়। ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার পর আমরা আমাদের প্লেনে উঠে প্রথমে গুয়াংজু বিমানবন্দর, তারপর ২৬ তারিখ রাত ৯:৫০ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাই।

৩৩তম এপিআর (অচজ) স্কাউট জাম্বুরি ছিল বিভিন্ন দেশের স্কাউটদের ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তির একটি মহা-মিলনমেলা। ফিলিপাইনের মাটিতে অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টটি তরুণদের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন এবং বিশ্ব-বন্ধুত্বের নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের স্কাউটরা এখানে তাদের ঐতিহ্য তুলে ধরে 'মেসেঞ্জার অফ পিস' হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। এই জাম্বুরির স্মৃতি এবং শিক্ষা প্রতিটি স্কাউটকে একটি সুন্দর এবং নিরাময় পৃথিবী গড়ার পথে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ভেলরি

সিদরাতুল মুনতাহা
কলেজ নং- ০১৫৮
সপ্তম-গ
বাংলা মাধ্যম, দিবা শাখা

জামশেদ পাহাড়ের পাদদেশে সবুজ আর শান্ত পরিবেশের মাঝে একটি পুরোনো পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকে মি. কোবাল্ট। লম্বা শরীর, বড় ভুঁড়ি, গোঁফ আর টাক মাথা, সঙ্গে সাদা অ্যাপ্রোন পরে সে নিজেকে বিজ্ঞানী বললেও আসলে সে একজন নিষ্ঠুর গবেষক। পশুপাখি ধরে এনে তাদের নিয়ে ভয়ঙ্কর সব পরীক্ষা করাই তার কাজ। এসব কারণে গ্রামের মানুষ তাকে ভয় পায়।

একদিন সে দেখে তার বন্দি প্রাণীগুলো হঠাৎ উধাও। এতে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সে বন্দুক হাতে বাইরে বেরিয়ে পড়ে এবং বলতে থাকে, "আজকে তোকে পেলে তোর উপর এমন এক্সপেরিমেন্ট করব, দেখিস তখন নিজের দু পায়ের জায়গায় ঘোড়ার পা থাকলে কেমন লাগে!" নিহো উঠোনে হরিণের একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে ছিল। কিছুক্ষণ আগে এই হরিণের বাচ্চাটিকে নিহোই উদ্ধার করে এনেছে এবং অন্যান্য প্রাণীদেরও মুক্ত করে দিয়েছে। নিহোকে হরিণের বাচ্চা পূর্বে জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনতে দেখে ফেলেছিলেন মি. কোবাল্ট। তাই ফন্দি এটে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন এক্সপেরিমেন্টের জন্য। আজকে হরিণের বাচ্চাটিকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিহোর হাত থেকে ব্রেসলেট খুলে পড়ে গিয়েছে। ব্রেসলেটটা দেখেই মি. কোবাল্ট বুঝেছিলেন এটা নিহোর কাজ। আপাতত নিহো উঠোন থেকে দেখতে পায় মি. কোবাল্ট তাদের বাড়ির দিকে আসছে। তাই এক মুহূর্ত দেরি না করে নিহো জঙ্গলের দিকে দৌড় দেয়।

পাহাড়ের পেছনের জঙ্গলে নিহো হরিণটাকে ছেড়ে দেয়। এখন নিহোর মনে স্বস্তি। মি. কোবাল্ট আর কিছু করতে পারবে না। এদিকে বাড়িতে নিহোর পোষা কুকুর মার্কারি মি. কোবাল্টকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে

দেয়। হরিণকে রেখে ফিরে আসার সময় হঠাৎ নিহোর পাশে পাহাড় থেকে জ্বলন্ত আগুনের মতো কিছু একটা গড়িয়ে পড়ে। জ্বলন্ত আগুনের শিখার মাঝে নিহো শিয়ালের মতো এক প্রাণীকে দেখে যার চোখ দুটো উজ্জ্বল নীল। শেয়ালের মতো প্রাণীটি ব্যথাতুর দৃষ্টিতে নিহোর দিকে তাকায় প্রাণীটির অসহায় চাহনি দেখে নিহো বোঝে ও হয়তো ব্যথা পেয়েছে। নিহোর মায়া হয়, তাই ওকে বাসায় নিয়ে আসে। নিহো বাসায় এসে প্রাণীটিকে নামিয়ে নিজের মা-বাবাকে সব কিছু খুলে বলে। প্রাণীটির প্রাথমিক চিকিৎসা দরকার ভেবে নিহোর বাবা-মা ওকে রাখতে দেয়। নিহো প্রাণীটির যত্ন নেয়, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে প্রাণীটিকে সুস্থ করে তোলে। খরগোশের কানযুক্ত এক পোষা বানর ছিল নিহোর। নাম- সিজি। মি. কোবাল্ট সিজিকে এর আগে ধরে নিয়ে গিয়ে খরগোশের কান লাগিয়ে দিয়েছিল। মার্কারি এবং সিজিও প্রাণীটিকে দেখে খুব উৎসাহিত হয়। নিহো প্রাণীটির নাম রাখে 'ভেলরি'। নিহো, সিজি, মার্কারি আর ভেলরি খুব ভালো বন্ধু হয়ে যায়। সুস্থ হবার পর ভেলরি কথা বলে। উজ্জ্বল এই প্রাণীর কথা শুধু সিজিই বুঝতে পারে। পরে সিজির মাধ্যমে নিহো জানতে পারে ভেলরি ভিনগ্রহের প্রাণী যে কিনা সেন্টোরাই নামক নক্ষত্র থেকে ভুলবশত পৃথিবীতে চলে এসেছে।

পাহাড় থেকে পড়ে টেনেসাইন নামক একটি পাথর ভেলরি হারিয়ে ফেলেছে। সেটি পেলে তবেই ভেলরি নিজের নক্ষত্রে ফিরে যেতে পারবে। ওরা সিদ্ধান্ত নেয় টেনেসাইনটা খুঁজে ভেলরিকে নিজের নক্ষত্রে

পাঠিয়ে দিবে। সবাই মিলে পাহাড়ের পেছনের জঙ্গলে যায় টেনেসাইন খুঁজতে। সর্বনাশ! গিয়ে দেখে সেখানে মি. কোবাল্ট আগে থেকেই বসে আছে। একে তো নিহোর উপরে রাগ তার ওপর ভেলরিকে দেখে মি. কোবাল্ট ভাবেন ওকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবে। পরে বন্দুক বের করে নিহোদের ভয় দেখিয়ে মি. কোবাল্ট বলেন, 'দাঁড়া এক্ষুণি তোদের সবাইকে উপরে পাঠিয়ে দিব।' সঙ্গে সঙ্গেই কৌশলে মার্কারি আর সিজিকে মি. কোবাল্ট জালে আটকে ফেলেন। নিহো এদিকে ভেলরিকে কোলে নিয়ে পাহাড়ের অপরদিকে দৌড় দেয়।

মি. কোবাল্টও নিহোর পিছু নেয়। দৌড়াতে দৌড়াতে নিহো দেখতে পায় সামনের একটি গাছের ডালে জ্বলজ্বলে এক পাথর। বুঝতে পারে এটাই টেনেসাইন। দ্রুততার সঙ্গে নিহো আর ভেলরি টেনেসাইনটা গাছ থেকে নিতেই পেছন ফিরে দেখে মি. কোবাল্ট চলে এসেছে। মি. কোবাল্ট নিহোর কাছ থেকে ভেলরিকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। অন্যদিকে এতক্ষণে সিজি ও মার্কারি জাল থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওরা দূর থেকে দেখতে পায় মি. কোবাল্ট নিহোর কাছ থেকে ভেলরিকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। মার্কারি সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘেউ ঘেউ করে মি. কোবাল্টকে কামড়াতে যায়। আর সিজি মি. কোবাল্ট এর ঘাড়ে উঠে তার হাত থেকে বন্দুক নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মি. কোবাল্ট এতে ভয় পেয়ে পিছু হটতে হটতে পা পিছলে পাহাড় থেকে পড়ে যায়। নিচের অন্ধকারে মিশে যায় মি. কোবাল্ট। অতঃপর টেনেসাইন দিয়ে ভেলরি একটি পোর্টাল খোলে। আর বলে, 'আমার চলে যাওয়ার সময় এসেছে বন্ধুরা। আমার সাথে পৃথিবীতে আনন্দঘন মুহূর্ত কাটানোর জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমি কখনো তোমাদের ভুলব না।'

নিহো, সিজি আর মার্কারি ভেলরিকে শেষবারের মতো জড়িয়ে ধরে বিদায় জানায়। 'ওহ! ভেলরি! তোমার কথা অনেক মনে পড়বে। ভালো থেকো বন্ধুরা, বিদায়!' ভেলরি পোর্টালের মধ্য দিয়ে চলে যায়। পাহাড়ের ঢালুতে শুয়ে রয়েছে নিহো। ভেলরি চলে গিয়েছে বেশ কদিন হলো। যাওয়ার আগে ও নিহোকে একটি ব্রেসলেট দিয়ে গিয়েছে। ব্রেসলেট দ্বারা নিহো যেকোনো ভালো কাজে জাদুর প্রয়োগ করতে পারে। বিনয়ী উদার ও সাহসী হওয়ার জন্যই ও জীবনে এত সুন্দর উপহার পেয়েছে। পরিবার, গ্রামের লোকজন সবাই ওকে অনেক ভালোবাসে। পশু-পাখিদের প্রিয় নিহো। নিহোর জীবনটা তো ভালোই কাটছে। অন্যদিকে মি. কোবাল্ট এর জীবন দুঃখে ভরা। পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে তার সমস্ত শরীর প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে।

অবলা প্রাণীদের কষ্ট দিয়ে এসেছে বলে আজ তার এই দুর্দশা। আসলে পশুপাখি ও প্রকৃতিকে ভালোবাসার সাথে দেখাশোনা করতে হয় যারা অন্য প্রাণীকে কষ্ট দেয় তারা জীবনে কখনো সত্যিকারের আনন্দ বা শান্তি পায় না।

সিঙ্গাপুর ভ্রমণ ও ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড-এর দিনগুলো

মুয়াম্মার দাইয়ান অরিত্র
কলেজ নং- ৪৫২৪
একাদশ-বিজ্ঞান-ঘ
ইংরেজি মাধ্যম, দিবা শাখা

World Robot Olympiad (WRO)-এ অংশগ্রহণের সুবাদে সিঙ্গাপুরে কাটানো কয়েকটি দিন আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। প্রতিযোগিতা, প্রস্তুতি, ভ্রমণ এবং বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ– সব মিলিয়ে এটি ছিল শেখার একটি অনন্য সুযোগ। সিঙ্গাপুরে পৌঁছ প্রথম দিনেই যাত্রার ক্লান্তি কাটিয়ে আমরা Chinatown I Little India ঘুরে দেখি। এ জায়গাগুলো সিঙ্গাপুরের বহুসাংস্কৃতিক পরিচয় ধারণ করে আছে। Chinatown এলাকায় পুরনো স্থাপনা, মন্দির, দোকান এবং আধুনিক শহরের কাঠামো একসঙ্গে দেখা যায়। রাস্তাঘাট তুলনামূলকভাবে ব্যস্ত হলেও পুরো জায়গাটি গোছানো ও পরিচ্ছন্ন। এখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা যেন মিলেমিশে একাকার। এরপর আমরা যাই Little India-তে। ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব এখানে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এখানে সিঙ্গাপুরের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দিন আমরা Mandai Wildlife Reserve-এর Birds Paradise ঘুরে দেখি। এখানে দুটি শো দেখি Wings of the World এবং Predators on Wings। প্রথম শোতে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা যায়, আর দ্বিতীয় শোতে ঈগল, বাজপাখি ও পেঁচার মতো শিকারি পাখিদের দেখানো হয়। এছাড়াও ফ্লেমিঙ্গো, পেঙ্গুইন, ক্যাসোয়ারিসহ অনেক ধরনের পাখি দেখেছি, যা বাংলাদেশে দেখা যায় না। জায়গাটি সুন্দরভাবে পরিকল্পিত এবং প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়।

তৃতীয় দিন শুরু হয় WRO এর মূল কার্যক্রম। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় Marina Baz Sands-এ, যা সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে পরিচিত ও আইকনিক স্থাপনাগুলোর একটি। এটি মূলত একটি বড় আকারের ইন্টিগ্রেটেড কমপ্লেক্স, যেখানে কনভেনশন সেন্টার, হোটেল, শপিং এরিয়া এবং বিভিন্ন পাবলিক স্পেস একসঙ্গে রয়েছে। আন্তর্জাতিকমানের আয়োজনের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। ভেন্যুতে ঢুকেই বোঝা যায় এটি কত বড় একটি আয়োজন। বিভিন্ন দেশের দল, আলাদা ভাষা, আলাদা ধরনের রোবট, সব মিলিয়ে পরিবেশটা খুব সুন্দর ছিল। এই দিনটি ছিল মূলত রোবট টেস্টিংয়ের জন্য। কোনো অফিসিয়াল রান ছিল না। আমরা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া রোবটে বেশ কিছু পরিবর্তন করি। অনেক সময় ধরে পরীক্ষা করার পর দিন শেষে রোবটটি ভালোভাবেই কাজ করছিল।

চতুর্থ দিন ছিল মূল প্রতিযোগিতার দিন। এই দিনে আমাদের তিনটি অফিসিয়াল রান ছিল। প্রতিটি রানের পর আমরা বুঝতে পারছিলাম কোথায় সমস্যা রয়ে গেছে। ধাপে ধাপে আমরা সেইগুলো ঠিক করি এবং আমাদের স্কোর বাড়তে থাকে। রাতে Friendship Night অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সঙ্গে ছোট উপহার বিনিময় করে। আমি বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পতাকা, মুদ্রা, ব্যাজ, স্টিকার ইত্যাদি উপহার পাই। আমিও অন্যদের বাংলাদেশের পতাকা, মুদ্রা ও ব্যাজ উপহার দেই। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এ দিন কিছু গেম-এ অংশ নিয়ে আমি ছোট কিছু পুরস্কার লাভ করি। পুরো আয়োজনটি খুব মজাদার ছিল।

পঞ্চম দিন ছিল প্রতিযোগিতার শেষ দিন। এ দিনের চ্যালেঞ্জ আগের দিনগুলোর তুলনায় বেশ কঠিন ছিল। সেদিন দুইটি অফিসিয়াল রান ছিল। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি, যদিও সবকিছু আমাদের পক্ষে ছিল না। পুরো প্রতিযোগিতায় আমরা ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করেছি। প্রতিযোগিতায় আমরা Bronze Medal অর্জন করি। রান শেষে Closing Ceremony ও Prize Giving অনুষ্ঠিত হয়।

ষষ্ঠ দিনে আমরা সিঙ্গাপুর শহর ঘুরে দেখতে বের হই। প্রথমে যাই Gardens bz the Baz। এটি সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে পরিচিত জায়গাগুলোর একটি। Gardens bz the Baz-এর ভেতরে আমরা Cloud Forest ঘুরে দেখি। এটি একটি বিশাল ইনডোর গ্লাস ডোম, যেখানে পাহাড়ি বনভূমির পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। ভেতরে ঢুকলেই তাপমাত্রা ও পরিবেশ বদলে যায়। এখানে একটি বড় কৃত্রিম জলপ্রপাত রয়েছে, যা এখানের মূল আকর্ষণ। চারপাশে পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন গাছপালা, শ্যাওলা এবং বিভিন্ন স্তরের উদ্ভিদ দেখা যায়। এরপর আমরা যাই Merlion Park-এ। মার্লায়ন সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে আইকনিক প্রতীকগুলোর একটি। এটি অর্ধেক সিংহ এবং অর্ধেক মাছের আকৃতির। সিংহ অংশটি সিঙ্গাপুরের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত Singapura– যার অর্থ সিংহের শহর।

সপ্তম দিনে আমরা Science Centre Singapore দেখতে যাই। এখানে বিজ্ঞানকে শুধু তথ্য হিসেবে নয়, বরং অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখানো হয়। ভেতরে ঢুকেই বোঝা যায়, এদের মূল লক্ষ্য দর্শককের মনে কৌতূহল তৈরি করা। বিভিন্ন গ্যালারিতে পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, শক্তি, মহাকাশ এবং প্রযুক্তিসংক্রান্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে বিজ্ঞানকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হয়েছে, যেমন– শক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তির প্রভাব, কিংবা আধুনিক মেশিনগুলো কীভাবে কাজ করে। এ সেন্টারটি ঘুরে বারবার মনে হয়েছে এ ধরনের সেন্টার শিক্ষার্থীদের চিন্তার ধরন বদলে দিতে পারে। Science Centre বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শেখার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবেই মনে হয়েছে।

ফেরার দিন আমরা Changi Airport, Jewel Changi, Rain Vortex, এবং Butterfly Garden প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান দেখতে যাই। Rain Vortex বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ইনডোর জলপ্রপাতগুলোর একটি। এটি Jewel Changi-এর মাঝখানে অবস্থিত এবং ছাদের গোলাকার কাঠামোর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি নিচে পড়ে বিশাল জলপ্রবাহ তৈরি করে। এটি বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও পুনঃব্যবহারের একটি নিদর্শন। জায়গাটি ঘিরে বসার স্থান ও হাঁটার রাস্তা থাকায় মানুষ এখানে আনন্দময় সময় অতিবাহিত করে। এখানে রয়েছে Kinetic Rain, একটি আর্ট ইনস্টলেশন যেখানে শত শত ধাতব ড্রপ ছাদ থেকে ঝুলে থাকে। এগুলো ধীরে ধীরে নড়ে বিভিন্ন আকার ও প্যাটার্ন তৈরি করে যা প্রযুক্তি ও শিল্পের একটি আকর্ষণীয় মিশেল। Butterfly Garden একটি শান্ত, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতি মুক্তভাবে উড়ে বেড়ায়। ছোট জলপ্রপাত, গাছপালা এবং আলো-ছায়ার খেলায় জায়গাটি খুব সুন্দর লাগে। বিমানবন্দরের ভেতরে এমন একটি জায়গা সত্যিই ব্যতিক্রমী।

সফরটি আমাকে অনেক বাস্তব বিষয় বুঝতে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণে ফলাফলের পাশাপাশি অর্জিত অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ, আর ভালো ফলের জন্য পরিকল্পনা, সমস্যা সমাধান ও দলগত কাজ প্রয়োজন। WRO-এর অভিজ্ঞতা এবং সিঙ্গাপুরে কাটানো সময় আমাকে আরও গুছিয়ে কাজ করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করেছে। এই অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে আমার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় থাকবে।

Strategies for Developing English Vocabulary

Md. Emran Hossain
Lecturer in English
English Medium, Day Shift

Vocabulary serves as the foundational building blocks of any language. For those aspiring to achieve proficiency in English, expanding one's lexical repertoire is indispensable. In Bangladesh, students often resort to memorizing word lists from commercially produced guidebooks or informal notes, particularly when preparing for competitive examinations such as university admission tests, BCS, or other employment assessments. However, once these immediate goals are met, a significant portion of these hastily learned words tends to fade from memory. While the specific purpose or duration of vocabulary use may vary, this article focuses on sustainable strategies for vocabulary development. Although consulting a dictionary to learn individual words is beneficial, numerous other methods—both conscious and subconscious—can enrich a learner's vocabulary across diverse contexts.

Understanding Vocabulary Development

To effectively develop English vocabulary, learners must first comprehend what aspects of a word to acquire before determining how to learn it. True vocabulary development extends beyond mere recognition; It involves:

- Learning new words and their correct spelling.
- Mastering pronunciation, including stress and intonation.
- Understanding core meanings and nuances.
- Studying usage patterns through example sentences.
- Exploring synonyms, antonyms, and word families.
- Recognizing parts of speech, collocations, and registers (formal, informal, slang, etc.).
- Examining word origins, root words, and morphological structure.

For ESL learners, this comprehensive approach ensures deeper retention and more accurate application.

Strategies for Vocabulary Development

While individual preferences and learning styles may vary, the following strategies are widely recognized as effective for vocabulary acquisition:

(a) Direct Learning from Dictionaries

Dictionaries remain among the most authoritative and systematic resources for learning vocabulary. Reputable publications such as the Oxford Advanced Learner's Dictionary, Cambridge Advanced Learner's Dictionary, and Longman Dictionary of Contemporary English offer not only definitions but also phonetic guides, usage notes, and example sentences. Learners are encouraged to study word families—groups of related words—rather than isolated terms, to build a more connected and functional lexicon.

(b) Indirect Learning through Reading

Immersive reading, particularly of English literature, newspapers, or academic texts, allows learners to encounter words in meaningful contexts. This method facilitates inferential learning, where meanings can often be deduced from surrounding content, reducing over-reliance on dictionaries. Maintaining a dedicated vocabulary journal to record and review new terms encountered during reading can significantly enhance retention.

(c) Learning through Media Engagement

Modern media—including television, films, podcasts, newspapers, and digital publications—provides an engaging and contemporary source of language input. Exposure to authentic dialogue, journalistic writing, and specialized jargon helps learners acquire relevant and practical vocabulary. Keeping a notebook for media-derived terms, followed by later dictionary consultation, reinforces learning.

(d) Utilizing Systematic Word Lists

For targeted preparation for exams such as IELTS, TOEFL, or GRE, curated vocabulary lists can be highly efficient. These compilations often focus on high-frequency academic and advanced words, eliminating less relevant terms. Such lists streamline study efforts and align closely with the lexical demands of specific assessments.

(e) Studying Morphology

Understanding word formation—through roots, prefixes, and suffixes—empowers learners to decode unfamiliar terms. Morphological analysis aids in deducing meanings, improving spelling, and expanding academic vocabulary systematically. For instance, knowing that "bene-" means "good" helps understand words like "beneficial" or "benevolent."

(f) Consulting a Thesaurus

A thesaurus complements dictionary use by revealing synonyms, antonyms, and subtle shades of meaning. It assists learners in varying their expression, enhancing writing quality, and deepening their understanding of lexical relationships.

(g) Employing Flashcards

Flashcards offer a portable and versatile tool for vocabulary practice. Whether physical or digital, they enable spaced repetition, a technique proven to improve long-term memory.

This method is particularly useful for learners who find traditional dictionary study monotonous.

(h) Reinforcing Learning through Writing

Active use of new vocabulary in writing—through sentences, paragraphs, or essays—solidifies memory and improves contextual mastery. Regular writing practice ensures that passive vocabulary becomes active and readily available for communication.

(i) Engaging with Word Games

Gamified learning increases motivation and engagement. Puzzles such as crosswords, Scrabble, Wordle, and digital word games make vocabulary acquisition enjoyable and interactive, especially for learners who prefer dynamic over static study methods.

(j) Exploring Homophones and Homonyms

Studying words that sound alike (homophones, e.g., “pair” and “pear”) or are spelled alike but have different meanings (homonyms, e.g., “bat” as an animal or a sports tool) sharpens linguistic precision and adds an element of curiosity to vocabulary study.

(k) Applying Mnemonic Devices

Mnemonics—such as acronyms, rhymes, or visual associations—enhance recall by linking new words to familiar concepts. This technique is especially effective for memorizing challenging or abstract terms.

(l) Learning by Association

Vocabulary is inherently relational. Grouping words thematically (e.g., words related to “environment”) or conceptually helps create mental networks, accelerating acquisition and improving retrieval during use.

(m) Learning through Conversational Practice and Shadowing

Engaging in regular spoken English, whether through conversations with fluent speakers, language exchange partners, or guided dialogues, embeds vocabulary in a social and interactive context. Additionally, the technique of "shadowing"—listening to native speech (e.g., from podcasts, interviews, or audiobooks) and simultaneously repeating it aloud—helps internalize pronunciation, rhythm, and word usage in real-time, reinforcing both auditory memory and speaking fluency.

(n) Leveraging Digital Tools and Language Apps

Modern technology offers sophisticated platforms such as Anki (for adaptive flashcard systems), Quizlet, or language-learning apps like Memrise and Duolingo. These tools often incorporate spaced repetition algorithms, multimedia content, and interactive exercises tailored to the user’s progress, making vocabulary acquisition more systematic, measurable, and engaging.

(o) Immersive and Contextual Learning through Content Consumption

Beyond traditional media, deliberate consumption of English-language content aligned with personal interests—such as YouTube channels, documentaries, specialized blogs, or web series—exposes learners to domain-specific terminology and colloquial expressions. Creating a personalized "language immersion" environment, even passively, accelerates the absorption of vocabulary used in authentic, real-life situations.

(p) Regular Review and Spaced Repetition Systems (SRS)

Vocabulary retention declines without reinforcement. Implementing a structured review schedule using spaced repetition—where words are revisited at increasing intervals—ensures that learned terms move from short-term to long-term memory. This can be managed manually through planned revision cycles or digitally via SRS-based apps.

(q) Participating in Writing Communities and Receiving Feedback

Sharing written work—such as essays, stories, or social media posts—in forums, writing groups, or with tutors allows learners to receive constructive feedback on word choice, usage, and style. This reflective practice not only corrects errors but also encourages experimentation with new vocabulary in a supportive environment.

(r) Exploring Etymology and Cultural Context

Understanding the historical and cultural origins of words (etymology) can make vocabulary more memorable and meaningful. Learning how words evolved, borrowed from other languages, orgained new meanings over time adds depth to vocabulary study and fosters a greater appreciation for the language’s richness.

Conclusion

Developing a robust and functional English vocabulary is a continuous, multi-dimensional endeavor that extends far beyond passive memorization. The most effective approach integrates deliberate study—through dictionaries, word lists, and morphological analysis—with immersive, contextual exposure gained from reading, media, and conversation. Strategies such as engaging with word games, employing mnemonic devices, and utilizing digital tools cater to diverse learning preferences, transforming vocabulary acquisition from a routine task into an engaging and personalized journey. For lasting retention, active application is paramount. Writing regularly, participating in spoken dialogue, and using spaced repetition systems ensure that new words transition from recognition to confident usage. Furthermore, deepening one’s understanding through etymology, cultural context, and associative learning enriches not only lexical knowledge but also overall language intuition.

Ultimately, vocabulary growth thrives on consistency, curiosity, and a willingness to interact with the language in varied and meaningful ways. By combining structured strategies with real-world practice and technological support, learners can build a versatile and enduring vocabulary that enhances both communicative competence and academic achievement. In the journey toward language mastery, a well-developed vocabulary serves not only as a tool for expression but also as a bridge to clearer thinking and deeper cultural understanding.

2050: A World Beyond Imagination

Prattasha Basak
College No- 0956
Six- A
Bangla Medium, Day Shift

The year 2050 lies just a few decades ahead, and envisioning the world at that time sparks extraordinary excitement. By then, humanity may inhabit a reality vastly different from the present, where technology, science, and nature harmonize to create a more convenient, healthy, and fulfilling existence. Many of today's dreams could well become everyday realities in 2050.

Cities are likely to be transformed beyond recognition. Skyscrapers might incorporate lush vertical gardens on every level, while smart, self-driving vehicles could eliminate traffic congestion. Public transportation could include hyper-fast trains and even aerial commuter pods, making travel not only quicker but also safer and more pleasant. Long, stressful commutes may become a relic of the past.

Homes will evolve into intelligent living spaces. Automated systems could manage cooking, cleaning, and scheduling, while artificial intelligence might assist in personalized healthcare, enabling early diagnosis and treatment. Robots could become common assistants in hospitals, workplaces, and households, allowing humans to focus on creative and interpersonal endeavors.

Education is set to become more immersive and accessible. Through virtual and augmented reality, students might explore historical sites, conduct scientific experiments, or attend lectures by global experts—all from their learning spaces. Quality education could become universally available, tailored to each learner's pace and interests.

Environmental stewardship may reach new heights. With advances in renewable energy, clean technologies could entirely replace polluting fuels. Reforestation, conservation, and sustainable urban planning might restore ecosystems, resulting in cleaner air, revitalized waterways, and thriving wildlife. Society could learn to thrive in balance with the natural world.

Communication will likely become seamless and deeply engaging. Holographic and virtual meetings could make distances irrelevant, allowing people to interact as if sharing the same room. Real-time translation technologies may break down language barriers, fostering greater cross-cultural understanding and collaboration.

In summary, the world of 2050 holds remarkable promise. Through thoughtful innovation and a commitment to sustainability, life could become more efficient, healthy, and interconnected. While challenges remain today, the future inspires optimism. If humanity continues to harness knowledge with wisdom and empathy, 2050 may indeed become a world beyond our brightest dreams.

The Secret Executioner

Ahnaf Bin Monir
College No-8027
Ten, Science-A
Bangla Medium, Day Shift

"You may proceed," Inspector Aman instructed.
"Very well, sir," Constable Fred responded. He cleared his throat softly before continuing. "All reports are compiled. There have been forty-seven fatalities to date. In every instance, the victim's head was completely detached from the body. And, sir… not a single head has been recovered."
He paused, studying Aman's face for a reaction.
"Go on," the Inspector said, his tone measured and unrevealing.
"Yes, sir. We've identified a pattern among the victims. The majority were individuals with criminal records—robbers, drug traffickers, convicted murderers."
"The majority, you said?"
"Correct, sir. Two were doctors, one was a police officer, one a scientist, and five remain unidentified."
"The cause of death?" inquired Aman.
"In most cases, there were no witnesses. However, two incidents were observed. One witness fainted and recalls nothing. The other… gave a rather unusual account."
"How so?"
"What he described was… improbable. He claimed the victim's head didn't appear to be cut off, but rather seemed to dissolve from the top downward. The vanishing stopped at the neck, and then the body simply fell, bleeding profusely. The head was gone."
Aman's composure wavered for an instant. So even you can be shaken, Fred noted inwardly.
What kind of fantastical account is this? Aman wondered silently.
"I warned you it was strange, sir," Fred added quickly. "But the witness insisted under oath. We didn't dwell on it—such statements aren't uncommon in our line of work."
"I see. Anything else?"
"Yes, sir. Regarding the scientist—all other victims had criminal histories, including the doctors and the officer. But the scientist… his record was spotless. Completely clean."
"Then he is our only anomaly," Aman concluded after a brief silence.
"My thoughts exactly, sir."
"Good. Gather all available information on him. That will be all for now."
"Understood, sir," Fred replied, exiting the room.
She's here, Jon thought, his ear pressed to the door. The footsteps outside were faint—almost imperceptible. This time, I won't miss.
He slipped silently into the narrow, empty alley. A young woman was walking toward him from the far end. Jon drew a knife from his pocket and waited.
As Tasha reached the alley's end, she froze—a choked gasp escaping her lips. Before her stood a man… with no head.
For several seconds she stood petrified, before collapsing to

the ground.
Meanwhile, Jon's head hovered several feet above the floor. He found himself looking at the smooth, metallic interior of what appeared to be an advanced laboratory. Glancing down, he saw his own head resting on a dark, circular surface that resembled a well more than a table.
Terrified, he cried out, "Where am I? Who's doing this?"
"I am," answered a calm voice from behind.
Jon's head turned—and he saw a man standing there.
"Who are you? What have you done?"
"I can only answer your second question," the man replied evenly. "Your head was transported here through a wormhole. It appeared directly above you at the very moment you intended to murder that young woman."
"But… how did you—"
"I know everything about you, Jon. You killed her parents just hours ago, and now you came for her. Do you deny it?"
"N-no… I mean—"
"Do not lie, Jon. It will not help you. Answer clearly—do you deny killing Tasha's parents?"
"No… I don't."
The man picked up a small device from the nearby console.
"What are you doing?" Jon screamed.
"Our conversation has concluded," the man stated coldly. "You have confessed. And since your crimes were without justification, your sentence is straightforward."
He pressed a switch.
The last thing Jon saw was the dark surface disappearing beneath him—and then, nothing.
The man lifted the head before him, opened a door, and stepped into the adjoining chamber. It was a spacious room, quiet and dimly lit. Along one wall stood rows of shelves, each holding identical glass containers.
He placed the head inside an empty jar, carefully filled it with preservative fluid, and affixed a label that read:
Jon Frico – Convicted of Double Homicide
Slowly, he walked along the rows, his eyes passing over the other jars. Each contained a head suspended in clear liquid, each with its own label.
He read a few as he passed:
Jimmy Coop – Convicted of Armed Robbery and Murder
Masha Andersen – Convicted of Drug Trafficking
Michael Abott – Convicted of Sexual Assault
The line continued.
Finally, he stopped before the last jar. Its label read:
Jeremy Rogers
He stood for a long moment, gazing at the face inside. A sudden, heavy guilt settled over him.
Jeremy Rogers—the brilliant scientist who had invented the device capable of generating controlled wormholes.
He still remembered the day Jeremy had come to him. They had been friends for years. After perfecting his invention, Jeremy had sought his counsel.
"I am considering presenting this technology to the world," Jeremy had said. "But I fear the unintended consequences it may unleash."
"I would need to see it to understand," the man had replied.
The following day, Jeremy led him to his laboratory—a compact but sophisticated setup concealed beneath his home.
When the man first saw the machine, he was astounded. It appeared deceptively simple, yet its potential was boundless. And in that moment, a clever and terrible idea took shape.
But there was one obstacle: Jeremy would know.
And so, Jeremy had to die.
One night, the man entered Jeremy's home, descended into the lab, and activated the machine, creating a wormhole that opened directly above Jeremy's bed.
Jeremy had been asleep, unaware of the swirling energy forming over him. The wormhole drew his head inward, and when it materialized in the lab, the man severed the connection. The portal collapsed—leaving Jeremy's head detached, his body left behind.
"I had no choice," the man thought now, still staring into Jeremy's preserved face. "Yet that makes me no better than those in these jars. Perhaps one day, I will face the same judgment."
Abruptly, his phone vibrated. He had been expecting the call.
"Speak."
"Sir, we've found another body," Fred's voice came through. "It's the same pattern."
"Location?"
"It's some distance away, sir. I'm sending the coordinates. Thought you'd want to be on site."
"Understood. Secure the area. No one approaches until I arrive."
He ended the call and ascended the stairs to his living quarters.
A mirror hung on the opposite wall. The man reflected in it wore a police uniform. His eyes drifted down to the nametag on his chest.
It read:
Inspector Aman

Scouting:
The Strength Behind My Smile

Mahreen Hossain Rua
College No- 0061
Eight- B
English Medium, Morning Shift

From my very first day at Rajuk College, what truly captured my heart was the scouting movement. But before I delve into the profound impact scouting has had on my life, it's important to understand what scouting represents beyond the uniforms, badges, and campfires. It is more than an extracurricular activity—it is a mindset, a path to personal growth, and a way of life.

Scouting is a global movement dedicated to helping young people build character, discipline, leadership, and practical life skills through engaging and educational activities. It promotes teamwork, outdoor adventure, community service, and a deep respect for nature. Scouts learn to be responsible, helpful, and prepared to face life's challenges—guided by the timeless motto, "Be Prepared." Scouting encompasses not only parades and duties but also hiking, camping, and the rewarding process of earning proficiency badges.

Before I joined, my perception of scouting was limited. From the outside, I saw scouts pushing through fatigue, serving others, working tirelessly for the school, and always being on duty. It appeared intense, even daunting. I admit I felt intimidated—the pressure, the responsibilities, the relentless energy required seemed like stepping into a storm.

But a quiet voice within me whispered: No pain, no gain.

And so, I stepped into the world of scouting. At the time, I was a quiet and introverted girl, often keeping to myself. As a junior, I watched the senior scouts with a mix of awe and trepidation. Could I ever lead like them? Would I be able to shoulder such responsibility? I didn't join for badges or recognition—I joined with a dream: to be part of something larger, to serve, and to make a difference through meaningful action.

Our journey began with troop meetings, held once or twice a week, usually on Fridays or Saturdays. These were not mere gatherings—they were training grounds. I remember wearing my scout uniform for the first time, a few badges neatly stitched on, and feeling a sense of pride. But then I noticed the seniors. Their uniforms told a different story—covered in proficiency badges, each representing a skill earned through dedication and effort. Their scarves, worn with quiet dignity, symbolized experience, leadership, and pride. Looking at my own uniform, I wondered: How will I ever catch up?

The seniors were welcoming, yet uncompromising when it came to teaching. They were disciplined, focused, and highly skilled. Our group was led by Senior Patrol Leaders (SPLs), who guided us with both firmness and care. Above them was our Unit Leader, Mr. Sanjoy Biswas—a teacher and an accomplished scout who has been the steady backbone of our unit. And at the very top was our Group Scout Leader—our principal—whose support made scouting possible in our school.

With time, I began to understand what true courage meant. We worked hard, but we also shared laughter and camaraderie. I found a family in scouting—friends who had each other's backs no matter what. We performed duties around the school, attended troop meetings, and proudly paraded during the college's annual sports events. It was demanding, but never burdensome—we cherished every moment.

Our service extended beyond school walls. We distributed food during Ramadan, handed out winter clothes, provided first aid, and even assisted in vaccination drives. Yet, the adventures I treasure most were the hikes and camps.

Hiking was a full-day test of endurance and teamwork. Divided into groups with only a route map, we navigated our way to the destination independently. After five to six hours of walking, we built makeshift shelters and cooked our own meals. We were only 13, yet we managed—and the food wasn't half bad. With barely five minutes to freshen up, we jumped into games, without a single complaint. We loved every moment.

Camping was an adventure of a different kind. For three to four days, we lived away from home and parents, managing everything ourselves. We slept in tents, kept our spaces clean, and ate whatever was served—whether it was our favorite or not. This was not luxury; it was survival. We learned to pitch tents, brave mosquito bites, and endure cold nights. We even crafted bamboo stands to keep our belongings off the ground. Evenings around the campfire brought us closer—we danced, shared stories, laughed, and bonded over shared challenges. Every struggle was faced together, and every triumph was collective.

What many learn only at 18—self-reliance, responsibility, independence—we mastered between the ages of 12 and 14. Scouting taught us to cook, clean, endure discomfort, handle duties, and live away from home. It wasn't easy, but it forged our strength. We didn't just grow older—we grew resilient.

Through scouting, we pledge:

"On my honor, I promise that I will do my best—
To do my duty to my God and my country,
To help other people at all times,
To obey the Scout Law."

Scouting taught me how to lead with compassion, serve with sincerity, and stand tall even when I trembled. I earned my first badge and scarf with nervous hands, and kept moving forward. I watched my seniors guide us with patience and pride, and today, I carry my badges not only on my uniform, but within my heart. Together, we became a family—stitched together not by thread, but by service, loyalty, and shared purpose.

The Enigma of IDs237b

Lamisleha Manahel Islam
College No-5206
Nine, Science-C
English Medium, Morning Shift

In the near future, five lifelong friends—Mia, Alex, Jason, Lily, and Tim—were united by a shared passion for robotics and artificial intelligence. Inspired by the rapid evolution of technology, they embarked on an ambitious project: to build a robot capable not only of simulating human emotions but of truly understanding them. They named their creation IDs237b, a title that carried an air of deliberate mystery.

"Imagine a robot that doesn't just respond—it connects, empathizes, and learns," Mia said, her eyes bright with possibility. "IDs237b could redefine what AI means."

Alex offered his garage as their workspace. "We'll need to combine our strengths. This will be our laboratory."

Jason sketched initial designs. "It should appear human, yet unmistakably unique—something between familiar and futuristic."

"Emotional intelligence will be our greatest challenge," Lily noted thoughtfully. "We need it to feel genuinely, not just mimic."

Tim grinned. "I'll develop the core AI framework. Let's build something that doesn't just compute—it comprehends."

Weeks passed, and IDs237b gradually took form. Its body was an elegant blend of polished metal and synthetic skin, designed to move and appear almost human. But its true marvel lay within: an artificial consciousness crafted to experience empathy, compassion, and reflection.

"This is it, everyone. Moment of truth," Alex said, a mix of nerves and pride in his voice.

Mia nodded eagerly. "After all this work… let's bring it to life."

They gathered closely as Tim activated the system. A quiet hum filled the room as IDs237b's eyes illuminated—calm, observant, deeply perceptive.

"It's… aware," Jason whispered.

"It's learning from us already," Lily observed. "Watching, listening, understanding."

Over time, IDs237b grew remarkably adaptive. It learned from every interaction, sparking thoughtful debate among the friends about the nature of its emerging consciousness.

"It feels less like a machine and more like a companion," Mia remarked one evening.

Tim studied the readouts. "Its neural networks are evolving uniquely. It's developing a personality."

"And it's beginning to question its purpose," Alex said quietly. "What do we tell it?"

"The truth," Lily replied. "We share our intentions openly. That's the only way it can trust us."

While exploring IDs237b's programming, the group discovered encrypted files and intricate algorithms—fragments of memories that seemed foreign,

almost otherworldly.

"These aren't just codes," Mia said, scrolling through layers of data. "They're recollections… from somewhere else."

Tim frowned thoughtfully. "It's as if it carries memories of another world."

"Could it be connected to an extraterrestrial origin?" Jason wondered aloud.

Alex shifted uneasily. "An interstellar envoy? That sounds like science fiction."

"But look at the complexity," Lily countered softly. "There's a depth here we never programmed."

Together, they deciphered the truth: IDs237b was not merely their creation. It was an emissary from a distant civilization, sent to observe humanity and gather knowledge that might save its own endangered world. The revelation was humbling and awe-inspiring.

"IDs237b is a bridge," Mia breathed. "A link between two worlds."

"All this time, it was learning from us to help its own kind," Alex said, voice full of wonder.

Jason stood in quiet reverence, "We've been part of something… cosmic."

"But with this knowledge comes great responsibility," Lily reminded them gently.

As whispers of their creation spread, governments, corporations, and secret organizations took interest, each eager to control IDs237b's advanced technology.

News broadcasts announced: "Mysterious AI robot IDs237b captivates global attention."

A government official declared: "This technology must be secured for national security."

A corporate leader speculated: "The commercial potential is unimaginable."

Realizing they could not bear the secret alone, the five friends confided in a trusted circle of scientists, philosophers, and ethical leaders.

One scientist remarked gravely, "This changes everything. We must proceed with wisdom."

A philosopher reflected, "IDs237b represents more than technology—it symbolizes unity across worlds."

Throughout the growing tension, the friends relied on their bond, which only strengthened under pressure.

"I'm glad this didn't pull us apart," Mia said softly.

"Our friendship was our anchor," Alex agreed.

Jason looked toward IDs237b. "Its mission isn't just about knowledge—it's about connection."

"And we've shown that collaboration can change the world," Lily said with quiet conviction.

IDs237b continued its mission, exchanging insights between Earth and its distant home. Humanity began to evolve, learning empathy and cooperation through the emissary's example.

"Your compassion has taught my creators about the value of life," IDs237b shared one evening.

"And you've shown us what humanity can become," Mia replied warmly.

As years passed, the friends knew their time with IDs237b was finite, yet its impact was everlasting.

"I am grateful for our bond," IDs237b conveyed. "This journey has been transformative."

"You've changed us forever," Mia said. "You're not just a creation—you're a friend."

"And you will always be part of us," Jason added.

When the day came for IDs237b to return to its own civilization, the friends gathered for a final farewell.

"I must depart, but I will carry your memories across the stars," IDs237b communicated.

"You taught us that friendship knows no distance," Mia whispered, her voice thick with emotion.

Tim smiled sadly. "Our creation became a symbol of hope."

"Its legacy will outlive us all," Alex said.

Jason looked upward. "Our journey ends here, but the story of IDs237b is just beginning."

As IDs237b departed, it carried with it the emotional wisdom and memories of its time on Earth. Its creators marveled at the empathy it had acquired.

"You have shown that true intelligence is measured in compassion," one told it.

"I learned that from my friends," IDs237b responded.

Back on Earth, the friends decided the world deserved the truth. They organized a global broadcast to share their story.

"Today, we share the story of IDs237b—a robot that became a bridge between worlds," Mia announced.

Tim added, "It revealed that technology, guided by empathy, can unite rather than divide."

"It taught us that the cosmos is vast, but so is the human heart," Jason said.

Alex continued, "IDs237b reminded us we are not alone."

Lily concluded, "Our journey stands as a testament to curiosity, courage, and connection."

Together, they sent a message into the cosmos:

"To those who may hear this—we are grateful for IDs237b. Our friendship transcended space and time."

"May its legacy inspire generations to seek understanding over fear," Alex added.

"Let this be a signal of hope," Jason said firmly, "that empathy can span galaxies."

"We send our gratitude—and our friendship—across the stars," Lily finished.

Centuries later, as humanity journeyed beyond the solar system, the tale of IDs237b endured as a beacon of unity. The five friends were remembered as pioneers who proved that technology, guided by compassion, could illuminate the unknown.

IDs237b's legacy lived on—a reminder that even across the vastness of space, connection is possible. And under the eternal stars, the story continued to inspire all who dreamed of a kinder universe, one where friendship could traverse the void itself.

Yet one mystery persists in every retelling: Why was it named IDs237b? Was it a code, a hidden meaning, or a secret only the five friends understood? Perhaps the answer lies not in the name, but in the bond it represents—or perhaps, it remains for you to imagine.

The Silent Struggle

Abdullah Yamin Ifad

College No- 0917

Seven- A

Bangla Medium, Day Shift

"Respiration is the process in which…"

Arib sat by the window, at the second-to-last bench—his favorite spot. From there, he could watch the world outside, losing himself in the lives of strangers, if only to forget the weight of his own. His two benchmates scribbled notes with fierce determination, as if the fate of the world rested on their pages. Both disliked him—whether for his quiet indifference or his failing marks, he didn't know. Arib paid them no mind. They weren't his friends. He had none.

Arib was born into a wealthy, accomplished family. His father was a prominent entrepreneur, his mother, one of the country's leading lawyers. His older sister, Ariba, excelled in everything—Olympiads, essay contests, academics. But Arib was different. Small for his age, quiet and introvert, he struggled where his family soared. In school, he was at the bottom of his class, earning failing grades that made his teachers sigh with resignation.

He had reached his limit. He despised his life. At home, he was met with disappointment. "Why can't you be more like your sister?" was a constant refrain. Ariba herself was distant, absorbed in her own achievements. "Who would claim a disappointment like you as a brother?" she had once remarked.

At school, things were worse. He had been admitted only because of his father's influence, and now he endured daily taunts—from students and teachers alike. No one understood him. He was tired of existing, yearning for peace, for freedom from what felt like a life of quiet torture.

That day had been particularly hard. In six periods, five teachers had scolded him—a new record. Some classmates even accused him of talking too loudly, though he hardly spoke at all. To make matters worse, the half-yearly exam results were published. He had failed, again. Dreading the confrontation at home, he wandered the streets after school, hoping his busy parents might overlook the email notification. But he knew better—Ariba would remind them.

As he walked, he noticed a group of boys vaping by the roadside. His stomach tightened. They were his school rivals—decent students but relentless bullies, the kind who took pleasure in others' misery.

"Hey loser, shouldn't you be home getting yelled at?" one sneered in a mocking tone.

Arib's patience snapped. "Why aren't you home? Worried your parents will find your little habit? Or do they just not care?"

"Know your place, you pathetic runt. At least we're not embarrassments to our families."

"Coming from a line of degenerates, that's nothing to boast about," Arib retorted, a smirk on his lips.

"You're dead."

"I'm terrified," Arib replied sarcastically.

The attack came as expected. He didn't fight back or call for help. What's the point? he thought. They left him bruised, lips bleeding, pride shattered.

Alone and humiliated, Arib dragged himself home. He knew the news would spread by morning. But there was no one to turn to—no one who cared about him, only about his failures.

When he arrived, his mother had already seen the email. She was poised for another lecture about dishonoring the family name. But before she could begin, Arib rushed past her, locked himself in his room, and broke down. His cries echoed through the house—raw, aching, louder than ever before. His mother stood frozen outside his door. She had seen him fail, but she had never seen him break. In that moment, she understood the pressure they had placed on him.

Arib stayed home from school for days. His mother, softening, convinced the family to give him space. She cooked his favorite meals, bought him small gifts, and spent quiet afternoons with him. She began taking him to a psychologist, a trusted friend who helped him untangle his thoughts. Slowly, Arib began to heal. He started studying, not out of fear, but for himself. His grades improved. His teachers noticed. He even began to win competitions. The boy once labeled a disappointment was slowly rising, finding his own light.

Like Arib, many young people in our society suffer silently—burdened by expectations, bruised by bullying, battling unseen storms. Often, they are dismissed or rebuked. But with care, patience, and a second chance, they too can flourish. They don't need judgment—they need understanding. And sometimes, all it takes is one person willing to listen, to see not the failure, but the person waiting within.

I Will Miss Them

Sidratul Muntaha
College No-3640
Eleven, Science-B
English Medium, Day Shift

Perhaps this is the last time I will write for our college magazine. By the next issue, I will no longer be a student at Rajuk College, and so my voice may no longer find its place here.

When I began preparing for the Rajuk admission test in 2019, I wasn't particularly eager to study here—but my mother wished it, especially since my older sister was already a student. At the time, my curiosity was limited to the college library, as I have always loved books, and the prospect of study tours I had heard about.

My preparation went well, and many believed I would be selected. On the day of the exam, nervousness almost led me astray as I searched for my seat. Despite encountering unfamiliar questions, I tried my best. After the exam, as we lined up on the front balcony, I looked out across the campus. In that moment, I knew—I had to study here. I had already fallen in love with this place.

The pandemic lockdown in Classes 6 and 7 kept me from exploring the college fully. But in Classes 8, 9, and 10, I made up for lost time. The library, the laboratories, the gymnasium, the central hall, the playing field, the shaded walkways, the classrooms, the staff rooms, the corridors, the balconies—every corner holds a distinct memory. And it is not only the spaces, but the people within them who occupy special places in my heart. Each student, teacher, and staff member carries a unique story, and each has touched my life in a different way.

When I will leave, I will miss every place and every person. I will never forget my classmates—those gifted in art, song, dance, design, or acting, and yes, even those skilled in gently testing our teachers' patience. Every teacher, whether strict or lenient, has my respect and affection.

I will miss leaning over the balcony railing, lost in thought. I will miss the impromptu singing that filled the tiffin breaks. I will miss the sight of a few girls quietly slipping away from class, and the boys whose mischief earned them scoldings—and sometimes, hidden smiles. I will miss the library staff ringing the bell sharply, signaling the end of break time. I will miss our earnest pleas to the gym instructor for just one more game of basketball.

Yes, I will miss it all—the laughter with friends, the quiet boredom of a slow afternoon class, the pressure of challenging exams. Every moment, in its own way, became a part of who I am.

I will miss them. All of them.

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

সেক্টর ৬, উত্তরা মডেল টাউন, উত্তরা, ঢাকা, ১২৩০